৭.১৮ করাল থাবা – Bangla Library

৭.১৮ করাল থাবা – Bangla Library

করাল থাবা– ১১৮

একটা করাল থাবা বনহুরকে শূন্যে তুলে নিলো। একটা অদ্ভুত বিস্ময়কর শব্দ। শব্দটা যান্ত্রিক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক পিঠের ওপরে শব্দটা মনে হচ্ছে। একটা নখের সঙ্গে আটকে আছে বনহুরের পিঠের জামা।

বনহুর বেশ বুঝতে পারলো রক্তপায়ী বাদুড় তাকে আক্রমণ করেছে এবং তাকে শূন্যে তুলে নিয়েছে। অন্ধকার আকাশ, ক্রমান্বয়ে বনহুর উপরের দিকে উঠছে, আরও ওপরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। এত বিপদেও বনহুর দিশা হারায় না। সে অনুধাবন করে রক্তপায়ী বাদুড় কোন জীব বা জন্তু নয়। কারণ তার মুখগহ্বর থেকে যে আওয়াজ বেরিয়ে আসছে সেটা যান্ত্রিক শব্দ ছাড়া কিছু হতে পারে না। শব্দটা রহস্যময়।

বনহুর অনুভব করছে নিঃশ্বাস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে। হয়তো তার মৃত্যুও হতে পারে, তবু সে ঘাবড়ে যায় না। হাত দুখানা তার মুক্ত তাই সে অতি সাবধানে তার হাতঘড়ি আকারের ক্ষুদে ওয়্যারলেসটার চাবি অন করে দিলো, জানে বনহুর আস্তানায় তার অনুচরগণ প্রতীক্ষা করছে তার সংবাদ জানার জন্য।

শত শত মাইল দূরে বনহুরের আস্তানায় ওয়্যারলেস মেশিনকক্ষে যে অনুচরটি পাহারারত ছিলো সে দেখলো সাংকেতিক লাল আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। সঙ্গে সঙ্গে রহমানকে সংবাদ জানিয়ে দিলো। রহমান এসে চাবিটা ঘুরাতেই ভেসে এলো আশ্চর্যজনক সেই শব্দ। যে শব্দটা তারা আরও একবার শুনেছিলো যেদিন তাদের এক অনুচরকে রক্তপায়ী বাদুড় তুলে নিয়েছিলো শূন্যে।

রহমান ও অপর অনুচরটি বুঝতে পারলে তাদের সর্দার রক্তপায়ী বাদুড়টার কবলে পড়েছে এবং এ শব্দটা তারই।

যতক্ষণ রহমান ওপাশ থেকে কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে না পারে ততক্ষণ সে কোনো কথা বলতে পারবে না, কারণ বনহুর যদি শত্রুহস্তে বন্দী হয় বা ঐ ধরনের কোনো বিপদে পড়ে তাহলে বনহুর নিজে তার সংবাদ জানাবে। আস্তানা থেকে কোনো কথা প্রথম বলা বনহুরের নিষেধ ছিলো।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো রহমান ও তার সঙ্গীটি। নিশ্চয়ই সর্দার এমন কোনো অবস্থায় আছে যে সে কোনো সংবাদ পাঠাতে পারছে না, তবে তার ক্ষুদে ওয়্যারলেস চালু করা আছে সেটা বেশ বুঝতে পারে তারা।

রহমান ও তার সঙ্গীটি বিচলিত হয়ে পড়লো। কারণ সর্দার যে কোনো বিপদে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর তাকালো চারদিকে।

আকাশে তারার মালা তাকে যেন ঘিরে রেখেছে। যান্ত্রিক শব্দটা তার কানকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, চোখে সে সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। যদিও পৃথিবী তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন তবু বনহুর আঁচ করতে পারছে সবকিছু।

কান্দাই পর্বতমালার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রক্তপায়ী বাদুড়টি বনহুরকে নিয়ে।

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগুচ্ছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর অনুমান করলো, যান্ত্রিক জীবটা তাকে নিয়ে নীচের দিকে নামছে। অন্ধকারে বেশ বোঝা যাচ্ছে সেটা পর্বতের কোনো এক অংশ।

একসময় তাকে নিয়ে জীবটা নেমে পড়লো।

বনহুর উবু হয়ে পড়লো নিচে।

জীবটা তাকে চীৎ করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে।

বনহুর দেখলো একটা মনুষ্যমূর্তি অন্ধকারে তার দিকে দুটো ডানা মেলে দিচ্ছে। তার থাবায় একটা ভীষণ ধারালো নখ। নখটা অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর। অন্ধকারেও নখটা স্পষ্ট দেখলো বনহুর।

নখসহ থাবাটা বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়ালো এবং দ্রুতগতিতে কয়েক পা সরে গেলো পেছনে।

থাবাটা ভীষণবেগে এসে পড়লো বনহুর যেখানে উবু হয়ে পড়েছিলো সেখানে। পর্বতমালার একটি শৃঙ্গ বলা যায় ঐ স্থানটিকে। থাবাটার সঙ্গে যে নখটা ছিলো সেটা আটকে গেলো শক্ত মাটি আর পাথরের মধ্যে।

বনহুর এ সুযোগ অবহেলা করলো না, সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো মনুষ্যমূর্তি আকারের রক্তপায়ী বাদুড়টার ওপরে। বনহুরের কোমরের বেল্টে ছিলো সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। ছোরাখানা সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুলে নিয়েছিলো।

ছোরাখানা বসিয়ে দিলো বনহুর রক্তপায়ী বাদড়টার দেহে। এখনও সেই থাবা উঠে আসেনি মাটি আর পাথরের ভেতর থেকে।

একটা তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এলো রক্তপায়ী বাদুড়টার মুখগহ্বর থেকে। একি! এ যে মানুষের কণ্ঠস্বর।

বনহুর ছোরাখানা তুলে নিলো এক টানে এবং এক পা দিয়ে চেপে ধরলো নখসহ থাবাটা। ততক্ষণে ঢলে পড়েছে রক্তপায়ী বাদুড়টি।

বনহুর অন্ধকারে ভালভাবে লক্ষ্য করলো, যন্ত্রণায় ছটফট করছে রক্তপায়ী বাদুড়টা, কিন্তু একি, এ যে মানুষ।

যে যান্ত্রিক একটা শব্দ হচ্ছিলো তা এখন সম্পূর্ণ থেমে গেছে। অন্ধকারে বনহুর বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো, এক সময় নিশ্চুপ হয়ে গেলো রক্তপায়ী বাদুড়টার দেহ।

বনহুর অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো, কারণ তাকে রক্তপায়ী বাদুড়টার সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাছাড়া সম্পূর্ণ ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে থাকতে হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। জীবনে নতুন এক অভিজ্ঞতার আস্বাদ বনহুর গ্রহণ করলো আজ।

অবশ্য বনহুর যা চেয়েছিলো তাই পেয়েছে।

শহর বন্দর নগর গ্রামে গঞ্জে যখন রক্তপায়ী বাদুড়ের ভয়ে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করছে তখন বনহুর নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। অবশ্য কারণ ছিলো, বনহুরের বিশ্বস্ত দুজন অনুচরদেরও রক্তপায়ী বাদুড় রক্ত শুষে নিয়ে হত্যা করেছে নির্মমভাবে। বনহুর রক্তপায়ী বাদুড়ের সন্ধানে বেরিয়েছিলো। যে অঞ্চলে বনহুরের অনুচরদ্বয়ের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিলো সেই অঞ্চলেই আজ বনহুর একা বিচরণ করছিলো। সত্যই রক্তপায়ী বাদুড় তাকে আক্রমণ করলো।

নির্বাক নয়নে বনহুর তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে। ছোরাখানা বাদুড়ের শরীরের খোলস ভেদ করে হৃদপিন্ডে বিদ্ধ হয়েছিলো, তাই সহজে মৃত্যু ঘটেছিলো রক্তপায়ী বাদুড়বেশী লোকটার।

প্রথমে আশ্চর্য হলেও সামলে নিলো বনহুর নিজকে। অবশ্য বনহুর ধারণা করেছিলো রক্তপায়ী বাদুড়টা কোনো জীবজন্তু নয়, তার ভিতরে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে।

রহস্য উদঘাটন হয়ে গেলো।

খোলসের নিচে মানুষ। শুধু মানুষ নয়, তার মধ্যে রয়েছে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। অতি আশ্চর্যভাবে তৈরি ছিলো খোলসটা। ভেতরে মেশিন রয়েছে যার দ্বারা সে আকাশে উড়তে পারতো, হাতের বা ডানার সঙ্গে রয়েছে নখযুক্ত থাবা। ঐ থাবার সঙ্গে রয়েছে রক্ত শুষে নেয়ার যন্ত্র। বাদুড়ের মুখটা অবিকল বাদুড়

আকারের ছিলো। কোনোক্রমে কেউ বুঝতে পারবে না ওটা আলখেল্লা বা খোলস। বনহুর আরও ভালভাবে খোলসের ভেতরে লক্ষ্য করে অবাক হলো। নখযুক্ত থাবাটার পাশেই রয়েছে একটা অদ্ভুত থলে, তার মধ্যে রয়েছে তাজা লাল টকটকে রক্ত।

বনহুর ভালভাবে এসব লক্ষ্য করছে, এমন সময় রহমান তার সঙ্গীসহ এসে উপস্থিত হলো। তারা বিস্ময় প্রকাশ করবার পূর্বেই বললো বনহুর–তোমরা যে রক্তপায়ী বাদুড় সম্বন্ধে বলেছিলে এ সেই রক্তপায়ী বাদুড়......

কিন্তু এ যে দেখছি মানুষ। বললো রহমান। চোখেমুখে তার বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বনহুর এবার উঠে দাঁড়ালো, এতক্ষণ সে রক্তপায়ী বাদুড়টার পাশে বসে ভালভাবে সবকিছু। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখছিলো।

রহমান ও তার সঙ্গীটিকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–আমি জানতাম রক্তপায়ী বাদুড় কোনো জীব নয়। কারণ তার উড়ন্ত অবস্থায় একটি আশ্চর্যজনক শব্দ হতো যা তোমরা অনেকেই আমার কাছে বর্ণনা করেছিলে।

বললো রহমান–হাঁ সর্দার, আমাদের মধ্য হতে যখন মাহাঙ্গু এবং মঙ্গলকে রক্তপায়ী বাদুড় তুলে নিয়েছিলো তখন আমরা শুনতে পেয়েছিলাম একটা আশ্চর্যজনক শব্দ। সর্দার, ঐ শব্দ আমরা কান্দাই আস্তানায় বসে ওয়্যারলেস মেশিনেও শুনতে পেয়েছি। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তাই সত্য হলো। রক্তপায়ী বাদুড় আপনাকে আক্রমণ করেছিলো। ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম আমরা। কারণ রক্তপায়ী বাদুড়ের কবলে যে একবার পড়েছে সে আর পরিত্রাণ পায়নি।

হাঁ তোমাদের অনুমান সত্য। ঐ ব্যক্তি কোনো শয়তান, যে মানুষের দেহের রক্ত শুষে নিয়ে অন্য কোনো রাষ্ট্রে চালান দিতো। ঐ দেখো বাদুড়ের খোলসটার মধ্যে একটি থলে রয়েছে, রক্ত শুষে নিয়ে যেখানে জমা করে রাখতে।

বড় আশ্চর্য।

হাঁ, আশ্চর্য বটে। সুন্দর এবং সুকৌশলে রক্ত সঞ্চয় করার একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা। এই খোলসটি তোমরা দেখছো এটা ব্যবহার করার নিয়ম কানুন আছে এবং এই

যে খোলসটি অতি নিপুণতার সঙ্গে তৈরি করা হয়েছিলো যার দ্বারা এই শয়তানটা তার ব্যবসা ভালভাবে চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে নিয়েছিলো। এ লোকটি কে এবং এর পরিচয় আমরা জানি না তবে নিশ্চয়ই এর কোনো দল বা ঘাটি আছে। রক্ত শোষণ করার পর সে এমন কোনো স্থানে ফিরে যেতে যেখানে রয়েছে আরও গোপন তথ্য যা আমরা জানি না।

এ কথা সত্য সর্দার। তবে আমার মনে হয় কান্দাই পর্বতের কোনো গোপন স্থানে এর দল বা আস্তানা আছে যেখানে সে বাস করে।

তুমি যা বলছে এ কথা মিথ্যা নয়, কারণ রক্তপায়ী বাদুড়টাকে যতবার দেখা গেছে কান্দাই পর্বতমালার আশেপাশে তাকে বেশি দেখা গেছে। মৃতদেহটা তুলে পর্বতের নিচে ফেলে দাও, তারপর ওর খোলসটা নিয়ে চলো। এই থাবাটা দেখছো এটাই হচ্ছে রক্ত শোষণ করার যন্ত্র। এটা দিয়ে রক্তপায়ী বাদুড় তার উদ্দেশ্য সফল করতো।

সর্দার, আমরা ভাবতেও পারিনি রক্তপায়ী বাদুড় মানুষ।

হাঁ রহমান, এমনি কত খোলসধারী মানুষ এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে ফিরছে যাদের আসল রূপ বোঝা মুস্কিল। রহমান কথা বলতে বলতে হঠাৎ ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো–সর্দার সরে দাঁড়ান–সরে দাঁড়ান একটা পাথর পর্বতের শৃঙ্গ থেকে খসে পড়ে গড়িয়ে আসছে......রহমান সঙ্গীটিকে নিয়ে দ্রুত সরে দাঁড়ালো।

বনহুরও ক্ষিপ্রগতিতে সরে দাঁড়িয়ে ছিলো।

একটি বৃহৎ আকার পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছে। ভাগ্যিস রহমান পাথরটিকে দেখতে পেয়েছিলো নইলে একসঙ্গে বনহুর, রহমান ও তাদের অনুচর সবাই মিলে মত্যবরণ করতে।

পাথরটা রক্তপায়ী বাদুড়বেশী লোকটার দেহ থেতলে পিষে ফেললো, তার সঙ্গে থেতলে গেলো রক্তপায়ী বাদুড়টার অদ্ভুত খোলস।

বনহুর উপরের দিকে তাকিয়ে বললো–রহমান, মনে হয় পাথরটা এমনিই খসে আসেনি। ওটা কোনো অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় খসে পড়েছে।

তাই মনে হয়। বললো রহমান।

অপর সঙ্গীটি বললো–সর্দার, আমি জানি এই পর্বতের ওপরে কোনো এক দেবতা থাকেন, তিনি মাঝে মাঝে বিরূপ হন এবং এমনিভাবে পথচারীদের ওপর পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করেন।

বনহুর তার অনুচরটির দিকে তাকিয়ে বললো–এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

সর্দার, আমার এক আত্মীয় কান্দাই পবর্তমালার পাদদেশে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিলো সে নিজের চোখে দেখেছে কান্দাই পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গদেশ থেকে অকস্মাৎ একটি বড় পাথর খসে গড়িয়ে পড়লো এবং তার তলায় একজন বৃদ্ধ কাঠুরিয়া চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করলো।

কতদিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে ছিলো শিবনাথ?

শিবনাথ মাথা নিচু করে ভেবে নিয়ে বললো–কয়েক বছর আগে।

শিবনাথ জাতিতে সাওতাল।

তারা দেবতা বিশ্বাস করে এবং এ কারণেই সে এ কথা বললো।

বনহুর ওর কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনলো। কি যেন ভালো সে গভীরভাবে,, তারপর বললো–রহমান আর শিবনাথ, তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে। আমি কান্দাই পর্বতমালার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গটিতে উঠতে চাই।

বনহুরের কথায় শিবনাথের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে উঠলো, বললো সে–সর্দার, ঐ শৃঙ্গ অত্যন্ত ভয়ংকর। ওখানে কেউ উঠতে পারে না সর্দার।

কেন পারে না? বললো বনহুর।

সেখানে দেবতা বাস করেন।

ও, সেই কারণেই আমি ওখানে যেতে চাই শিবনাথ। আমি ওখানে যেতে চাই শিবনাথ। তোমাদের সেই দেবতার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

সর্দার।

হাঁ শিবনাথ।

সর্দার..

বুঝেছি, তুমি যেতে চাও না?

শিবনাথ নীরব।

বনহুর বুঝতে পারে তার মনোভাব। শিবনাথ দুর্দান্ত সাহসী হয়েও দেবতার নামে ভীষণ কাহিল এবং ভীতু তা বেশ অনুধাবন করা যায়।

শুধু শিবনাথ নয়, এমনি আরও অবুঝ জাতি আছে যারা পাহাড় পর্বত আগুন এবং জীবজন্তুকে পূজা করে চলেছে। একটু হাসলো বনহুর কারণ পাহাড় পর্বত পাথর আগুন এসবের কি আর প্রাণ আছে। প্রাণহীন বস্তু এবং জীবজন্তুর কোনো কর্মদক্ষতা নেই......যাক এসব নিয়ে এখন ভাববার সময় নেই। তাকে ঐ সুউচ্চ শৃঙ্গে পৌঁছাতে হবে।

বনহুর রহমান এবং শিবনাথকে লক্ষ্য করে বললো–তোমরা অবশ্যই আমার সঙ্গে থাকবে। বললো রহমান–আচ্ছা সর্দার।

শিবনাথ সরল মানুষ, মনে মনে ভয় পেলেও সর্দারের সম্মুখে কোনো কথা বলতে সাহসী হলো না সে।

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নিলো সেই রক্তপায়ী বাদুড়বেশী লোকটার থেতলে যাওয়া দেহটার দিকে, তারপর রহমান আর শিবনাথসহ পর্বতমালার শিখরের দিকে অগ্রসর হলো।

বললো রহমান–সর্দার, তাজ আর দুলকী নিচে আছে।

বললো বনহুর–তারা কি মুক্ত অবস্থায় আছে?

হাঁ,

তাহলে ভাববার কিছু নেই। বললো বনহুর।

শিবনাথ মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছে। তার মুখমন্ডলে ফুটে উঠেছে একটা ভয়ার্ত

বনহুর হেসে বললো–শিবনাথ, তোমার দেবতার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তোমার কথা বলবো, তুমি তার একজন পরম ভক্ত।

সর্দারের কথায় হাসবার চেষ্টা করলো শিবনাথ। মনে তার ভয়! কপালে হাত ঠেকিয়ে বারবার দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাচ্ছে, বললো শিবনাথ–সর্দার, দেবতারা সব বুঝতে পারেন। আমরা তার কাছে যাচ্ছি ঠিক বুঝে নিয়েছেন।

তাই নাকি? চলতে চলতে বললো বনহুর।

শিবনাথ বললো–আমার বাবা তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো।

সত্যি!

হাঁ সর্দার। তার চোখ দুটো ছলছল হয়ে ওঠে, বললো সে–আমার বাবা আর ফিরে আসেনি।

থমকে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে তাকালো বনহুর শিবনাথের দিকে। তোমার বাবা এই পর্বতমালার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলো?

হাঁ

কতদিন পূর্বে স্মরণ আছে তোমার?

আছে–প্রায় বছর দুই পূর্বে।

বনহুর বললো–হুঁ।

এবার কোনো কথা নয়, দুর্গম পথ অতিক্রম করে বনহুর, রহমান আর শিবনাথ এগিয়ে যাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ভীষণ খাড়া পথ। একটু পা ফসকে গেলে আর উদ্ধার নেই। পড়ে যাবে হাজার ফিট নিচে। পাথর আর পাথর ছাড়া কিছু নেই সেখানে। কাজেই পড়ে গেলে হাড়গোড় গুড়ো হয়ে থেতলে মৃত্যুবরণ করতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাবধানে চলতে গিয়েও মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছিলো তাদের।

হঠাৎ এক সময় শিবনাথ পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেলো, ভাগ্যিস বনহুর ধরে ফেলেছিলো তাকে। তাই প্রাণে বেঁচে গেলো শিবনাথ।

বনহুর বললো–দেখলে শিবনাথ, একটু অসাবধান হলেই সর্বনাশ হয়েছিলো আর কি।

সর্দার, দেবতা নারাজ হয়েছে.......

ও তাই তুমি পড়তে পড়তে বেঁচে গেলে?

হাঁ সর্দার, দেবতার আশীর্বাদ.......

ও, দেবতা তাহলে আর্শীবাদ করেছিলো?

সর্দার পাহাড়ের দেবতা বড় শক্ত। মাঝে মাঝে দেবতার মুখ দিয়ে আগুন বের হয়। কথাটা বলে আবার শিবনাথ ললাটে হাত দুখানা ঠেকালো।

সন্ধ্যা নাগাদ তারা কান্দাই পর্বতের শৃঙ্গদেশের কাছাকাছি পৌঁছে গেলো। ঝাপসা অন্ধকারে আর এগুনো সম্ভব না, তাই তারা সমতল একটা জায়গার সন্ধান করতে লাগলো। কিছুটা জায়গা হলে বনহুর রহমান এবং শিবনাথ রাতের মত একটু সংস্থা করে নিতে পারবে।

ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে, আর কিছুটা এনোর পর তারা একটি সমতল জায়গায় এসে উপস্থিত হলো। উচ্চ শৃঙ্গের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ওরা তিনজন বসে পড়লো। একটানা তারা অনেকক্ষণ হেঁটেছে। তাও সোজা পথ নয়, উঁচুনীচু পাহাড়িয়া পথ, বেশ পরিশ্রম করে এগুতে হয়েছে তাদের।

ক্ষুধা-পিপাসাও কম লাগেনি। সারাটা দিন তাদের কেটেছে এইভাবে।

বনহুরের ওপরই বিপদটা যদিও বেশি এসেছিলো তবু বনহুর এখনও মোটেই কাহিল নয়। তাকে বেশ প্রফুল্ল লাগছে।

বললো বনহুর–রাতের মত বিশ্রাম গ্রহণ করা যাক।

রহমান বললো–হা সর্দার। কিন্তু একসঙ্গে তিনজন ঘুমানো উচিত হবে না, নতুন কোনো বিপদ আসতে পারে।

হাঁ, তুমি ঠিক বলেছো রহমান, একসঙ্গে তিনজনের ঘুমানো চলবে না। তোমরা দুজন ঘুমাও, আমি জেগে থাকি।

রহমান বললো–সর্দার, তা হয় না, আপনি বেশি ক্লান্ত। আপনি ঘুমান, আমরা পরে ঘুমাবো।

হেসে বললো বনহুর–তোমরা ঘুমাও রহমান, আমি ক্লান্ত নই, জেগে থাকতে কোন অসুবিধা হবে না।

রহমান জানতো সর্দারের সঙ্গে বেশি কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। তাই রহমান শিবনাথকে ইংগিত করলো–ঘুমিয়ে পড়ো।

শিবনাথ এবং রহমান অল্পক্ষণেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো।

বনহুর বসে রয়েছে।

যদিও সে ক্লান্ত ছিলো তবুও সে ঘুমাতে পারলো না। বারবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই রক্তপায়ী বাদুড়বেশী লোকটার চেহারা। কি সাংঘাতিক তার রক্ত–শোষণ পদ্ধতি। কে এই লোক? নিশ্চয়ই তার কোনো ঘাটি আছে, যেখান থেকে সে সবার অজ্ঞাতে কাজ করতো।

হঠাৎ পিছনে পর্বতশৃঙ্গে একটি শব্দ ভেসে উঠলো, হুম, হুম, হুম।

তার চিন্তাধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শব্দের হুংকারে পর্বতমালা যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। বনহুর ফিরে তাকালো সেইদিকে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলো–একটা বিরাট আকার জমকালো মূর্তি পর্বতশৃঙ্গের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। অন্ধকারে মূর্তিটার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলছে।

বনহুর রহমান এবং শিবনাথকে জাগাবে কিনা ভাবছে এমন সময় জমকালো বিরাট মূর্তিটা আরও উঁচুতে উঠে দাঁড়ালো এবং অদ্ভুত হুম হুম শব্দ করতে লাগলো।

রহমান ও শিবনাথ ক্লান্তিতে গভীর ঘুমে অচেতন। তাই তারা এই শব্দে জেগে উঠলো না।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে রহমান এবং শিবনাথকে জাগিয়ে তুললো, তারপর আংগুল দিয়ে দেখালো এদিকে, যেখানে পর্বতশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে ঐ ভয়ংকর জমকালো মূর্তি।

শিবনাথ ভয়বিহ্বল কণ্ঠে বললো–সর্দার, এই তো দেবতা......দুহাত জুড়ে প্রণাম জানালো সে ঐ ভয়ংকর জীবটাকে।

রহমান থ হয়ে গেছে।

বনহুর বললো–রহমান, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি পর্বতের কোনো গুহা অথবা আড়ালে লুকিয়ে পড়। ঐ দেখো জীবটা শৃঙ্গ থেকে নেমে আসছে। বনহুর কথাটা বলে রহমান ও শিবনাথসহ দ্রুত অন্যদিকে এগুতে লাগলো। দৃষ্টি তাদের সেই জমকালো মূর্তিটার দিকে।

মূর্তিটা এগুচ্ছে আর হুম হুম্ শব্দ করছে।

বিরাট বিরাট লম্বা পা ফেলে এগুচ্ছে জীবটা। পর্বতের শৃঙ্গ থেকে অতি সহজেই নামছে সে পাথর বেয়ে বেয়ে।

বনহুর বললো–কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে।

হা সর্দার।

শিবনাথ বললো–সর্দার, দেবতা আমাদের প্রতি বিরূপ হয়েছেন। তার অজান্তে আমরা এসেছি তার সীমানার মধ্যে। তাই হয়তো দেবতা ক্ষেপে গেছেন।

শিবনাথের কথা শোনার সময় নেই বনহুরের। বললো বনহুর–দ্রুত দৌড়াও, জীবটা এসে পড়লো বলে।

রহমান, বনহুর আর শিবনাথ ছুটছে।

কিন্তু বেশিদূর এগুনো সম্ভব হলো না, সম্মুখে খাড়া পর্বতে সুউচ্চ দেয়াল পথরোধ করে। দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর বললো–আশেপাশে কোনো ফাটল বা গুহা

দেখা গেলে তার মধ্যে লুকিয়ে পড়ো। জীবটা প্রায় এসে গেছে।

বিকট চেহারা।

অন্ধকার রাতেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, পর্বতের গা বেয়ে দ্রুত নেমে আসছে সেই বৃহদাকার জীবটা।

হঠাৎ বনহুর সামনে একটি ফাটল দেখতে পেয়ে তার মধ্যে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। রহমান এবং শিবনাথকেও টেনে নিলো পাশে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে এলো লোমশ হস্তিপদের মত দুটি পা। জীবটা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছে, হয়তো বা খুঁজছে বনহুর, রহমান ও শিবনাথকে। ওদের একেবারে কাছে জীবটা।

বনহুর ভীত না হলেও একটু ভড়কে গেলো। কারণ জীবটার সঙ্গে লড়াইয়ে সে জিততে নাও পারে। তা ছাড়া রহমান আর শিবনাথ রয়েছে তার সঙ্গে। ওদের জীবননাশ ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ জীবটা ঘুরে দাঁড়ালো এবং বামদিক লক্ষ্য করে এগুতে লাগলো।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর ও তার সঙ্গীদ্বয়।

বললো এবার বনহুর–জীবটা কি ভয়ংকর।

রহমান বললো–সর্দার, দেখুন জীবটা বড় বড় পাথর তুলে নিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে।

হাঁ, সে আমাদের না পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠেছে। একবার যদি সে আমাদের অস্তিত্ব টের পায় তাহলে আমাদের নিস্তার নেই, ওর হাতে মৃত্যু বরণ করতে হবে। কথাটা বলে বনহুর ফাটলের মধ্যে আরও ভালভাবে ঠেশ দিয়ে দাঁড়াতে গেলো। ঠিক ঐ মুহূর্তে ফাটলের মধ্যের একটি পাথর নড়ে উঠলো।

আশায় আনন্দে দুলে উঠলো বনহুরের মন, চাপাকণ্ঠে বললো সে–রহমান, আমরা যে ফাটলটার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি তার পাশের পাথরখন্ডটি দুলছে।

সর্দার।

হাঁ রহমান।

তাহলে আমরা কোনো নতুন বিপদে.........কথাটা শিবনাথ বলতে গিয়ে থেমে পড়লো।

বনহুর বললো–আমার মনে হয় পেছন দিকে কোনো গুহামুখ আছে। কথাটা বলে বনহুর পাথরটা ধরে জোরে চাপ দিলো।

আশ্চর্য হলো তারা তিনজন।

পাথরটা একপাশে সরে গেলো আলগোছে। একটি সুড়ঙ্গপথ দেখো গেলো।

রহমান বললো–সর্দার গুহা। একটা গুহা।

হাঁ রহমান, ঠিক বলেছো এটা একটা গুহামুখ। আমরা রাত কাটানোর মত জায়গা পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

অকস্মাৎ গুহার ভিতর থেকে মানুষের গলার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে আসছে বলে মনে হলো।

বনহুর ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো–চুপ।

সর্দার, গুহার অভ্যন্তরে মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে।

হাঁ, তাই মনে হয়। ওদিকে জীবটা কতদূর সরে গেছে?

খুব বেশিদূর যায়নি সে তবে তাকে দেখা যাচ্ছে না। কি ভয়ংকর জীব......

বনহুর ভুলে গেলো জীবটার কথা, গুহার ভিতরে মানুষের কণ্ঠস্বর তাকে বেশি ভাবিয়ে তুললো। কান্দাই পর্বত গোটা দক্ষিণ–পূর্ব অঞ্চল নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই পর্বতের সীমানা বিস্তৃত।

কান্দাই পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে কেউ কোনোদিন আরোহণ করতে পারেনি।

পর্বতের বিভিন্ন শৃঙ্গে বহুবার বহু পর্বতারোহী আরোহণ করতে সক্ষম হলেও অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। খাড়া শৃঙ্গে আরোহণকালে তারা পর্বতশৃঙ্গের হাজার

হাজার ফিট উঁচু থেকে নিচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। তাছাড়া অনেকে নানা ধরনের বিপদে পড়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে।

কান্দাই পর্বতের এই অংশ অত্যন্ত ভয়ংকর, নানা ধরনের হিংস্র জীবজন্তু বাস করে পর্বতমালার পাদমূলের গহন জঙ্গলে।

এই জঙ্গলে শিকারী প্রবেশে সাহসী হয় না কারণ যারা শিকারে আসে তারা অনেকেই ফিরে আর যেতে পারে না। যারা জীবন নিয়ে ফিরে তারা নানা ধরনের আশ্চর্য কাহিনী শোনায়।

পর্বতের কোল ঘেষে চলে গেছে একটি পথ। সে পথে কোনোদিন কোন পথচারী ভুলক্রমেও পা বাড়াতো না। কদাচিৎ কোনো যানবাহন এসে পড়তো এ পথে যারা এই পথের ভয়াবহতা জানতো না। তবে কোনো কোনো সময় সাহসী শিকারীদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শিকারে আসতে অত্যন্ত শিকারের নেশার দরুন। দারুণ সাহস নিয়ে তারা এসেছে, বিপদগ্রস্তও হয়েছে। অনেকে আত্মাহুতিও দিয়েছে শিকারের সখ মেটাতে গিয়ে।

এ পথে সহসা সাহস পেতো না কেউ একমাত্র বনহুর ছাড়া।

বনহুরের অনুচরগণও এ পথে আসতে দ্বিধাবোধ করতো, না জানি কখন কোন হিংস্র জীবজন্তু হানা দিয়ে বসবে। তবে প্রয়োজনবাধে আসতে হতো তাদের কারণ সর্দারের নির্দেশ অমান্য করার সাহস ছিলো না কারও। মঙ্গল আর মাহাঙ্গুকে এ পথেই জীবন দিতে হয়েছে।

অবশ্য বনহুরও জানতে এই স্থান বড় দুর্গম। এই স্থানে পর্বতশৃঙ্গগুলোকে এক একটি দানবের মত মনে হয়। এই পর্বতের অত্যন্তরে যেন লুকিয়ে আছে পৃথিবীর সব রহস্য আর বিস্ময়। জানতো বনহুর তবুও তাকে বহুবার এ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অনুচরদের পাঠানো হয়েছে। নানা কারণে। প্রাণনাশও ঘটেছে অনেকের।

বনহুর সব জানে। আরও জানে এই পর্বতমালার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের ভীষণ ও ভয়ংকর রহস্য আত্মগোপন করে আছে। তাই বনহুর আজ কান্দাই পর্বতের মাঝামাঝি একটি গুহামুখে দাঁড়িয়ে গুহার অভ্যন্তরে মানুষের গলার ক্ষীণ

আওয়াজ শুনতে পেয়ে ততো আশ্চর্য হলো না। একটা রহস্য উদঘাটনের সম্ভাবনা উঁকি দিলো তার মনে।

তাই বনহুর রহমানকে বললো–রহমান, জীবটা আপাতত সরে গেছে তাছাড়া এমন একস্থানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি যে স্থানে তার নজর পড়বে না। তোমরা এখানে গুহামুখে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে চাই......

রহমান অন্ধকারে সর্দারের মুখোভাব লক্ষ করতে চেষ্টা করলো কারণ তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা ভাব ছিলো যা কোনো সময় রদবদল হবে না। কতকটা আদেশের সুর ছিলো।

বললো রহমান–আমরা আপনার আদেশমত কাজ করবো।

সজাগ থাকবে উভয়ে।

আচ্ছা সর্দার, কিন্তু..

আপনার সঙ্গে আমি বা শিবনাথ......

দরকার নেই। বনহুর নিজের কোমরের বেল্ট হতে সূতীক্ষ্মধার ছোরাখানা খুলে নিলো, তারপর অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হলো। তার কাছে ক্ষুদে ওয়্যারলেস ও টর্চলাইট আছে। রক্তপায়ী বাদুড়ের কবলে পড়েও এসব হারায়নি সে।

বনহুর অতি সাবধানে ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করলো। যদিও জমাট অন্ধকার তবু বনহুর টর্চ ব্যবহার করলো না। কারণ ঐ ফাটলের মধ্যে কোনো গুহা আছে যার ভিতর হতে ভেসে আসছে মানুষের গলার আওয়াজ। টর্চের আলো জ্বাললে আলোকিত হবে অন্ধকার গুহা। য়ারা গুহার অভ্যন্তরে কথা বলছে তারা টের পাবে, তাই আলো জ্বালানো সমীচীন মনে করলো না বনহুর।

ফাটলের মত সম্মুখে মনে হলেও সামান্য কিছুটা এগুতেই বনহুর মানুষের গলার আওয়াজ আরও স্পষ্ট শুনতে পেলো। বেশ কয়েকজন মিলে কথাবার্তা বলছে। খুব সাবধানে পা বাড়াচ্ছে বনহুর। পর্বতের অভ্যন্তরে মনুষ্য কণ্ঠস্বর তাকে অবাক না করলেও কম আশ্চর্য হয়নি সে। হঠাৎ এমন করে একটা রহস্যঘন বিস্ময়কর অবস্থার সম্মুখীন হবে এ মুহূর্তে তা ভাবতে পারেনি বনহুর। তার মনটা

উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই কোনো নরশয়তানের দল সেখানে, এই গোপন স্থানে আস্তানা গেড়েছে।

তারা কারা? বনহুরের মনে এই প্রশ্ন জাগলো। রক্তপায়ী বাদুড়ের কথা মনে হচ্ছে বারবার, কারণ এই ভয়ংকর জীববেশী লোকটার সঙ্গে এই গুহার সংযোগ থাকা অস্বাভাবিক নয়। বনহুর ছোরাখানা শক্ত করে মুঠায় চেপে ধরে এগুতে লাগলো।

সুড়ঙ্গপথ।

একটু অদ্ভুত ধরনের বটে।

অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ অনুধাবন করছে বনহুর, তা ছাড়া বনহুর রাতের অন্ধকারে ভাল দেখতে পেতো এটা তার অভ্যাস! তার চোখ দুটো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলো তাই অন্ধকারে চলতে তার তেমন কষ্ট হতো না।

আজ বনহুর যখন এগুচ্ছিলো তখন তার মনটা অস্থির ছিলো কারণ নানা ধরনের প্রশ্ন জাগছিলো তার অন্তর গহনে, হয়তো বা কোনো গভীর সমস্যার মোকাবেলার সম্মুখীন হতে যাচ্ছে সে।

দুপাশে জমাট পাথুরে দেয়াল।

মাথার ওপর তেমনি জমাট ছাদ; একটু জোরে চলতে গেলে মাথাটা ঠুকে যাওয়ার ভয়। সুড়ঙ্গপথটি সোজাসুজি ছিলো না, তাই মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছিলো বনহুর। সম্মুখে দুহাত প্রসারিত করে হাতড়ে হাতড়ে এগুচ্ছিলো সে।

বেশ কিছুটা এগুনোর পর এবার আলোক রশ্মি নজরে পড়লো তার। থমকে দাঁড়ালো বনহুর, বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে ভালভাবে তাকালে সে সামনে। যদিও সেখান থেকে বেশ দূরে ছিলো জায়গাটা তবু আড়ালে আত্মগোপন করে ভালভাবে তাকালো।

দৃষ্টি আলোকরশ্মির দিকে আকৃষ্ট হতেই বনহুর ভীষণ চমকে উঠলো, হাত পা-মুখ বাঁধা লোককে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক তাদের দেহের পোশাক পরিচ্ছদ আশ্চর্যজনক। সম্মুখের লোকটার দেহটা কালো রবারে আবৃত। শুধু মুখমন্ডলে হাল্কা আবরণ। আলোকরশিতে তাদের মুখমন্ডল বুঝবার জো নেই।

নিশ্চয়ই কোনো দুস্কৃতিকারীদের গোপন আড্ডা তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু যার হাত-পা–মুখ বাঁধা সে যেন পরিচিত মনে হচ্ছে। ওরা এমনভাবে লোকটাকে বেঁধেছে যে সে কোনো শব্দ করতে পারছে না।

একটা চেয়ারে লোকটাকে বসিয়ে দেয়া হলো। তারপর তার মুখের বাধন খুলে দেয়া হলো এবং কিছু বলা হলো তাকে।

বনহুর চমকে উঠলো ওর মুখের কালো কাপড়টা খুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আপন মনে বনহুর উচ্চারণ করলো–আরমান। এ যে আরমান। মনে পড়লো কিছুদিন হলো আরমানকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে কারা অপহরণ করেছে। একটা খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে গেলো বনহুরের মনে। এরাই তারা যারা আরমানকে নিখোঁজ করেছে। কি উদ্দেশ্য এদের বনহুর কান পেতে শুনতে লাগলো।

একটা বিরাটদেহী মানুষ ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। যদিও তার মুখটাও আবৃত ছিলো কালো কাপড়ে। বনহুর তবু ভালভাবে লক্ষ্য করলো যদি ওদেরকে চিনতে পারে।

কিন্তু চিনবার কোনো উপায় ছিলো না। বনহুর বুঝতে পারলো বন্দী যেন তাদের চিনতে না পারে এ জন্যই দুস্কৃতিকারী সাবধানতার সঙ্গে নিজেদের গোপন করে রেখেছে।

বনহুরের চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলে উঠলো। দূরের কথাগুলো মনে পড়লো, যেমন করে হোক আরমানকে খুঁজে বের করতেই হবে। আরমান তারই জন্য আজ পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে তা হতে দেবে না নূর। বনহুরের কানের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই কথাগুলো।

একটা অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীর সন্ধান সে পেলো এটা তার পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

শোনা গেলো চাপা এবং গভীর কণ্ঠস্বর–শোন আরমান, তুমি মুক্তি পাবে যদি নূরকে আমাদের হাতে তুলে দিতে পারো অথবা বিশ লাখ টাকা। বলো কোটায় রাজি আছো?

বনহুর আরও গভীরভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো, শুনতে চেষ্টা করলো কি জবাব দেয় আরমান। মশালের আলোতে ভয়ংকর লাগছিলো ঐ রবার আবৃত মানুষগুলোকে। মুখের কালো আবরণ আরও ভয়াবহ করে তুলছিলো ওদের।

শোনা গেলো আরমানের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর–নরপশু, তোমরা আমাকে যত শাস্তিই দাও আমি তোমাদের দুটো প্রস্তাবের একটিও মানতে রাজি নই।

বনহুর দেখলো চারপাশে পর্বতের এবড়ো থেবড়ো দেয়ালে নানা ধরনের মারাত্মক অস্ত্র টাঙানো রয়েছে। তার মধ্যে একটি অদ্ভুত ধরনের বস্তু চোখে পড়লো। বস্তুটা মুখোকৃতি অথচ সমস্ত মুখোশে কাটা সংযুক্ত রয়েছে।

দলপতি ইংগিত করলো–যাও ওটা নিয়ে এসো।

একজন এগিয়ে গেলো এবং ঐ সাংঘাতিক মুখোশ খুলে নিয়ে এলো।

দলপতি মুখোশটা হাতে নিয়ে বললো–জানো এটা তোমার মুখে পরিয়ে দিলে আর কোনোদিন তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না। তোমার মুখ থেকে যখন এই মুখোশ খুলে নেয়া হবে তখন তোমার মুখ আর তোমার পরিচয় বহন করবে না। মুখের স্থানে স্থানে মাংস উঠে আসবে এই মুখোশের সঙ্গে। বলো আমাদের কথায় রাজি?

আরমান কোনো জবাব দিলো না এবার।

তার শরীরের জামা ছিন্নভিন্ন।

হাত দুখানা পিছমোড়া করে বাঁধা। দেহের কোনো কোনো জায়গায় চামড়া কেটে রক্ত ঝরছে। মশালের আলোতে সব দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে আছে, ভাবছে এরা কারা–যারা আরমানকে আটক করে নির্মমভাবে শাস্তি দিচ্ছে?

দলপতির হুকুম হলো মুখোশটা রাখো, আরও কিছু সময় দাও......।

যে লোকটা সেই ভয়ংকর মুখোশটা আরমানের মাথাসহ মুখমন্ডলে পরিয়ে দিতে যাচ্ছিলো সে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো দলপতির মুখের দিকে।

দলপতি হাত দিয়ে ইংগিত করলো, ওটা রাখো, ওকে ভাববার সুযোগ দাও।

আদেশ পালন করলো লোকটা।

বনহুর ছোরাটা বাগিয়ে ধরে ভাবছিলো ঐ মুখোশটা আরমানের মুখে পরিয়ে দেবার পূর্বেই আক্রমণ করবে কিন্তু দলপতি যখন মুখোশটা ঐ মুহূর্তের জন্য রেখে দিতে বললো তখন বনহুর ছোরাখানা সংযত করে নিলো।

কানে গেলো বনহুরের, পুনরায় দলপতি বলছে–হীরালাল, তুমি ওর চোখ দুটো পুনরায় বেঁধে দাও।

দ্বিতীয় ব্যক্তি কালো রুমালখানা আরমানের চোখে পূর্বের মত করে বেঁধে দিলো। তারপর বেরিয়ে গেলো সবাই। হয়তো বা তখনকার মত ঐ স্থান পরিত্যাগ করলো তারা।

বনহুর এমন এক স্থানের সন্ধান পাবে ভাবতে পারেনি যেখানে পাবে সে আরমানকে। কান্দাই পুলিশমহল আরমানকে খুঁজে ফিরছে জানে বনহুর। তাছাড়া নূর তার বন্ধুকে হারিয়ে ব্যথিত মর্মাহত। সেও সন্ধান করে ফিরছে সর্বত্র। আরমানকে কান্দাই শহর থেকে দূরে বহুদূরে কান্দাই পর্বতমালার কোনো এক গহ্বরে আটক করে রাখা হয়েছে এটা কেউ জানে না।

বনহুর নিজেও জানতো না।

আর জানতো না বলেই এ মুহূর্তে বনহুর এই অদ্ভুত বিস্ময়কর স্থানে আরমানকে দেখে খুশি। হয়েছে মনে মনে। না চাইতেই বারিবর্ষণের মত।

ওরা আরমানকে রেখে চলে গেলো।

বনহুর অতি লঘু পদক্ষেপে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে এগুতে লাগলো।

দুপাশে শক্ত পাথুরে দেয়াল। মাথার ওপরে পাথুরে ছাদ, পায়ের নিচে পাথর! এবড়ো থেবড়ো পথ।

কয়েকবার হোঁচট খেলো বনহুর।

চারদিকে জমাট অন্ধকার।

পর্বতের গহ্বরে এমন একটা বৃহদাকার গুহা আশ্চর্য বটে।

আরমান হাত-পা মুখ চোখ বাঁধা অবস্থায় থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলো না। মশালগুলো দপ দপ করে জ্বলছে।

বনহুর আরমানের পাশে এসে দাঁড়ালো।

একটুও টের পেলো না আরমান।

বনহুর এবার আরমানের কাঁধে হাত রেখে চাপাকণ্ঠে বললো–আরমান।

বনহুরের কণ্ঠস্বরে আরমান আশ্চর্য হলো, কারণ এ কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ আলাদা লাগলো তার কানে। এ কণ্ঠস্বর পূর্বে সে কোথাও শুনেছে কিনা স্মরণ করতে চেষ্টা করলো কিন্তু স্মরণে এলো না এর স্বর সে পূর্বে কোথাও শুনেছে কিনা।

বললো বনহুর–আরমান, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমি তোমার অপরিচিত হলেও হিতাকাক্ষী।

আরমানের বিস্ময় কমলো না, তবে সে নীরব রইলো। বড় খুশি লাগছে তার মনে, এ স্বর তার কানে যেন মধুবর্ষণ করলো।

বনহুর খুলে দিলো আরমানের চোখের বাঁধন। তারপর হাত এবং পায়ের বাঁধন ছোরা দিয়ে কেটে ফেললো দ্রুতহস্তে।

অবাক চোখে মশালের আলোতে সে দেখলো বনহুরকে। কে এই লোক যাকে বড় আপন মনে হচ্ছে অথচ তাকে কোথাও দেখেছে কিনা মনে পড়ছে না আরমানের। একটি কথাও তার গলা দিয়ে বের হলো না, সব ব্যথা বেদনা, কষ্ট সব যেন মুছে গেলো অতি অল্প সময়ে।

বনহুর আরমানের মনের কথা বুঝতে পেরেও কোনো কিছু না বলে তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিলো। ওদিকে একটি পাত্রে পানি ছিলো, পাশে একটি গেলাস বনহুর সেই পাত্র থেকে পানি ঢেলে নিজে পান করলো, তারপর আরমানকে এক গেলাস পানি পান করালো।

এবার আরমান অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলো–আপনাকে কোথাও দেখেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না। কে আপনি? আর এখানে এলেনই বা কিভাবে?

বস বলবো–এখন আমি যা বলি তাই করো।

বলুন?

তোমার চোখ এবং হাত-পা বাঁধা ছিলো, কাজেই তুমি হয়তো বলতে পারবে না যা আমি জানতে চাইব।

হাঁ, আমি সঠিকভাবে কিছু বলতে পারবো না।

এরা কারা?

জানি না।

তুমি কি করে এখানে এলে?

তাও জানি না।

এখানে এমন অবস্থায় কথা বলা উচিত হবে না, কাজেই চলো আমরা এই গুহা হতে বেরিয়ে যাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে পথের নির্দেশ দিতে পারবো না জানি। তুমি আমার সঙ্গে চলো।

আরমান বনহুরের সঙ্গে এগুতে লাগলো।

কিন্তু কয়েক পা এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে বনহুর এবং আরমান লক্ষ্য করলো তাদের সম্মুখে একটি লৌহকপাট সা করে এসে পথরোধ করে ফেললো।

অপর দিকে অগ্রসর হতেই পুনরায় আর একটি লৌহকপাট তাদের পথ বন্ধ করে দিলো। মশালের আলো বা কোনো শব্দ আর তারা শুনতে পাচ্ছে না বা দেখতে পাচ্ছে না। বনহুর আরমানকে টেনে নিলো কাছে।

আরমানসহ বন্দী হলো বনহুর।

কিন্তু এরা কারা?

বন্দী অবস্থায় বনহুরের মনে বারবার এই প্রশ্ন জাগলো। আরমান আছে তার পাশে, কিছু তার কাছে জেনে নেয়া যাবে।

আরমান ভীষণ ঘাবড়ে গেছে, সে কোনো কথা বলতে পারছে না। হতভম্ব হয়ে পড়েছে সে, তার ওপর ভয়ংকর নির্যাতন চালানো হয়েছে যা তাকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তবু এ মুহূর্তে সে একজনকে পাশে পেয়েছে এটা তার পরম সৌভাগ্য। মনে সাহস জেগেছে, তবু দুজন একসঙ্গে বন্দী হয়েছে তারা। যা ঘটে দুজনের ভাগ্যেই ঘটবে।

বনহুর বললো–শত্রুপক্ষ আমাদের আগমন টের পেয়ে এই কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আরমান, তুমি একটুও বিচলিত হয়ো না।

আরমান অন্ধকারে ভাল করে ঐ মুখটা দেখতে চেষ্টা করলো সত্যিই এমন কণ্ঠস্বর ইতিপূর্বে সে শুনেছে কিনা। মহাবিপদ মুহূর্তে অবিচলিত কণ্ঠস্বর–শান্ত অথচ দৃঢ়।

বনহুর বললো–আরমান, তুমি আমার আসল পরিচয় জানো না। একটু থেমে বললো আবার সে–জানলে হয়তো বিচলিত হবে। তবে জেনে রাখো আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তোমাকে এদের কবল থেকে মুক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন যে অবস্থার সম্মুখীন আমরা হয়েছি তাতে সহজে আমরা সফলকাম হবে বলে মনে হয় না। আরমান

বলুন?

তোমাকে এরা কিভাবে এখানে এনেছে কিছু বলতে পারো?

আমি যখন এখানে আসি তখন আমার সংজ্ঞা ছিল না। তবে যখন সংজ্ঞা লাভ করলাম তখন দেখলাম আমার হাত-পা মুখ–বাঁধা। আমার কণ্ঠনালী তৃষ্ণায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখ বাঁধা থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছি না এবং মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হচ্ছে না, তারপর যখন আমার চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হলো তখন আমি দেখলাম একটা অন্ধকার গুহার মেঝেতে আমি শায়িত। আমার চারপাশে দণ্ডায়মান কয়েকজন অদ্ভুত পোশাকপরা মানুষ। তাদের চেহারা ও শরীর জমকালো রবারে আবৃত ছিল। আমার সংজ্ঞা ফিরে আসতে দেখে ওরা সাংকেতিক শব্দ করলো। একজন লোক সেই গুহায় প্রবেশ করলো এবং

আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে অপর এক গুহায় চলে এলো। তারপর আমার ওপর চালাতে শুরু করলো নানারকম নির্মম অত্যাচার।

হু, তারপর?

তারপর আমাকে কয়েক ঘন্টার জন্য রেহাই দিলো ওরা। আমার শরীর দিয়ে ঘাম ঝরছিলো। স্থানে স্থানে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। আমি আবার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন দেখলাম পূর্বের সেই ভয়ংকর পোশাকপরা লোকগুলো আমার চারপাশ ঘিরে আছে। আবার শুরু হলো নির্যাতন। কিন্তু......

কথা শেষ হলো না আরমানের।

একটা ভয়ংকর শব্দ হলো।

সমস্ত পর্বতমালা যেন কাঁপছে। দুলছে বনহুর ও আরমান।

হঠাৎ তাদের সম্মুখস্থ লোহার দেয়াল একপাশে কাৎ হয়ে গেলো। একাধারে ধসে পড়লো পর্বতমালার কিছু অংশ।

সেকি প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ, কানফাটা আওয়াজ। বনহুর বললো– আগ্নেয়গিরি লাভা উদ্গীরণ করছে....আরমান, এবার আমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখান থেকে বের হবার পথ আমাদের জানা নেই। যে পথে আমি প্রবেশ করেছিলাম সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

তাহলে উপায়?

এসো আমরা বেরিয়ে পড়ি। আরমান, বহুদিন পর কান্দাই পর্বতমালার আগ্নেয়গিরি ক্ষেপেছে। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না।

কিন্তু এগুবে কোথায়।

প্রচন্ড বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পর্বতমালা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। বনহুর আর আরমান দিশেহারা, তাদের চারপাশে লৌহবেষ্টনী, কাজেই

চারদিক রুদ্ধ বলা যায়। যদিও একপাশে কিছুটা খসে পড়েছে, কাৎ হয়ে আছে লৌহবেষ্টনীর কিছু অংশ।

বনহুর দেখলো এখানে এভাবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে জীবন রক্ষার চেষ্টা করা অনেক শ্রেয়। তাই বনহুর কাৎ হয়ে পড়া লৌহবেষ্টনীটি বলিষ্ঠ হাতে একপাশে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো।

অসাধারণ শক্তিশালী বনহুর। কিছুক্ষণ চেষ্টা চালানোর পর লৌহবেষ্টনী বা লৌহদেয়ালটা একপাশে খসে পড়ে গেলো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে বেরিয়ে এলো বনহুর ও আরমান। চারিদিকে তখন পর্বতমালার চাপ চাপ পাথর খসে পড়ছে। বনহুর আর আরমান গুহার ভেতর থেকে বের হবার পথ সন্ধান করছে। যে পথে বনহুর গুহায় প্রবেশ করেছিলো সে পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে, অনেক বড় একটি পাথর খসে পড়েছে গুহামুখে।

আরমান ও বনহুর ব্যস্তভাবে এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলো। তারা পবর্তগুহার মধ্যে হতে বেরিয়ে আসার পথের সন্ধান করতে লাগলো। যে পথে লোকগুলো চলে গিয়েছিলো সেই পথটাও চাপ চাপ পাথর ধসে দৃষ্টির আড়াল হয়ে পড়েছে।

বনহুর পাথরগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলো। আরমান তাকে সাহায্য করে চলল, একদিকে পর্বতমালার ভীষণ কম্পন এবং বিস্ফোরণ অপর দিকে পর্বতগুহায় বন্ধ হয়ে শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম। হঠাৎ বনহুরের মনে পড়লো রহমান আর শিবনাথের কথা। না জানি তারা কি অবস্থায় আছে। মৃত্যুবরণ করেছে কিনা কে জানে। কিন্তু এখন কিছু ভাবার সময় নেই, বনহুর আর আরমান তাদের জীবন রক্ষার্থে প্রাণপণ চেষ্টায় পাথর ও মাটি সরিয়ে ফেলতে লাগলো।

শরীরের অনেক জায়গায় আঘাত পেলো ওরা।

বনহুর আরমানকে যতদূর সম্ভব সাবধানে রাখলো। বড় বড় পাথরগুলো বনহুর নিজে সরিয়ে ফেলতে লাগলো। হঠাৎ পথ পেয়ে গেলো তারা। একটা পাথর খসে পড়তেই বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলল, দেখলো সামনে একটা সুড়ঙ্গপথ।

বনহুর আরমানের হাত ধরে দ্রুত সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলো।

সুড়ঙ্গপথে কিছুটা এগুতেই আরমান এবং বনহুর দেখতে পেলো কয়েকজন লোক পাথরচাপা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। ভাল ভাবে লক্ষ করবার সময় যদিও ছিলো না তবুও বনহুর বেশ বুঝতে পারলো মৃতদেহগুলো অন্য কারও নয়, এরা তারা যারা আরমানকে কিছু পূর্বে নির্যাতন করেছিলো। সুড়ঙ্গপথটি অপর এক গুহায় এসে প্রবেশ করেছে। এবং এটি সেই গুহা, যে গুহায় দুস্কৃতিকারিগণ বিশ্রাম করতো। গুহাটির ছাদ সম্পূর্ণ ধসে পড়ায় মৃত্যুবরণ করেছে তারা। তবে সবাই এই গুহায় ছিলো কিনা তা জানা নেই তাদের। ওরা মরেছে কতকটা নিশ্চিন্ত হলো বনহুর ও আরমান।

তবে আবার নতুন বিপদ দেখা দিলো।

এ গুহার মধ্য হতে বাইরে বের হবার পথ কোথাও নেই। আবার সেই পাথর সরানোর পালা। আরমান ও বনহুর যখন হন্যে হয়ে পথের সন্ধান করছে তখন একটা জড়িত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। কেউ বলছে দক্ষিণ দিকে পথ আছে ঐ পথে.....

কিন্তু কথা শেষ হয় না, থেমে যায়।

বনহুর ও আরমান সেইদিকে ছুটে যায়। কিন্তু কোথাও কোনো জীবিত মানুষ দেখতে পায় না তারা। শুধু প্রাণহীন দেহগুলো পড়ে আছে পাথরচাপা অবস্থায়। কোনোটা বা মেঝেতে, কোনোটা বা আসনে বসা অবস্থায় মরে আছে।

বনহুর দেখলো ওদিকে একজন দেয়ালের গায়ে পাথরচাপা পড়ে আছে তার মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের ওপর। মুখ দিয়ে তাজা রক্ত ঝরছে। বনহুর বুঝতে পারলো ঐ ব্যক্তিই তাদের সঙ্গে কথা বলেছে এবং কথা শেষ করবার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে।

বনহুর ওর পাশে গিয়ে মাথাটা একবার উঁচু করে ধরলো কিন্তু তখন তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

পর্বতের কম্পন কিছুটা কম মনে হচ্ছে তবে বিস্ফোরণের শব্দ মুহুর্মুহ সমস্ত পর্বতমালাকে প্রকম্পিত করে তুলেছে। এখনও চাপ চাপ পাথরখন্ড বিক্ষিপ্তভাবে খসে পড়েছে এদিক ওদিকে।

বনহুর ও আরমান সেই কণ্ঠস্বরের নির্দেশমত গুহাটির দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ভালভাবে পথের সন্ধান করতে লাগলো।

এমন সময় প্রচন্ড একটা বিস্ফোরণের শব্দ তার সঙ্গে সঙ্গে আবার পর্বতমালা প্রকম্পিত হলো ভীষণভাবে। পড়ে গেলো বনহুর আর আরমান। কয়েকটা পাথর আর ভগ্নপাথরকুচি ধসে পড়লো তাদের পাশে। ভাগ্যিস তাদের ওপর পড়লো না, তাহলে পর্বতগুহায় তাদের সমাধি রচনা হতো। কিন্তু তারা দেখলো পর্বতমালার ঝাঁকুনির ফলে দক্ষিণ দিকে কিছুটা দেয়াল ফাঁক হয়ে গেছে।

এবার বনহুরের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি আরমানকে তুলে দাঁড় করিয়ে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললো–আরমান, চলো আমরা ঐ পথে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, দেখি বেরুতে পারি কিনা।

আরমান ও বনহুর ঐ পথে দ্রুত পা বাড়ালো কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলো না, তারা দেখলো সম্মুখে বিরাট একটা কিছু পড়ে আছে। ভালভাবে লক্ষ করতেই তারা অবাক হলো এটা সেই জীব যে জীবটা প্রথমে তাদের তাড়া করেছিলো, সেই ভয়ংকর লোমশ জীব। ওর বিরাট দেহটা পাথরের চাপে থেতলে গেছে কিন্তু এখানে এলো কি করে? জীবটাকে তো তারা দেখেছিলো পর্বতশিখরে অথচ সে এখন গুহার তলদেশে উবু হয়ে পড়ে আছে।

বনহুর আর আরমান লক্ষ করলো পর্বতমালার সেই ভীষণ কম্পন এখন মন্থর হয়ে এসেছে।

বিস্ফোরণের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। তবে মাঝে মাঝে পাথর আর মাটি খসে পড়ছে তাদের আশেপাশে।

বিরাটদেহী জীবটার পাশে এসে দাঁড়াতেই বনহুর দেখলো ওপরে আকাশ দেখা যাচ্ছে। পর্বতমালার শৃঙ্গদেশও দেখতে পেলো।

বললো বনহুর–ওপর থেকে নিচে পড়ার সংগে সংগে মৃত্যুবরণ করেছে জীবটা এবং তার মাথাটা নিচের দিকে পড়ায় থেতলে গেছে একেবারে। এত সহজে এই বিশালকার জীবটা মৃত্যুবরণ করেছে দেখে কিছুটা অবাক হলো বনহুর।

কিন্তু জীবটাকে নিয়ে ভাববার সময় তাদের কোথায়। বনহুর আরমানের হাত ধরে বললো–এসো আরমান এই জীবটার দেহের ওপর দিয়ে আমরা ওপাশে পার

হয়ে যাই। নইলে দম আটকিয়ে মারা পড়তে হবে। জীবটার দেহ পচতে শুরু করলে ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হবো।

আরমানের শরীর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়েছে। মাতালের মত চলছে তার পা দুখানা। বনহুর বুঝতে পারে ক্ষুধা-পিপাসায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে আরমান। সত্যি বেচারা, এমনিতেই বয়স কম তারপর নির্মম নির্যাতন চলেছে তার ওপর। এমন অবস্থায় কাহিল হবার কথাই বটে।

বনহুর আরমানকে নিয়ে জীবটার দেহ পেরিয়ে কিছু উপরে উঠে এলো। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে তাদের, সমস্ত দেহ ধূলোমাটি আর পাথরের লালচে গুড়ায় অদ্ভুত আকার ধারণ করেছে। এ মুহূর্তে তাদের দেখলে কেউ চিনতে পারবে না। শরীর ঘামে ভিজে জবজব করছে। মাথার স্থানে স্থানে কেটে রক্ত ঝরছে। জামাকাপড় ছিন্নভিন্ন।

অনেক চেষ্টায় ওপরে উঠে এলো বনহুর আর তার সংগী আরমান। পৃথিবীর আলো বাতাস তাদের দেহ স্পর্শ করলো, কিন্তু তাদের নজরে যা পড়লো তাতে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। এ মুহূর্তে তারা পর্বতমালার হাজার হাজার ফিট ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে চাইতেই মাথাটা কেমন বো বো করে ঘুরে উঠলো, কারণ তাদের ধারণা ছিলো না এত উপরে উঠেছে। বিশেষ করে আরমানকে নিয়ে বনহুরের চিন্তা।

আরমান টলছে।

বনহুর ওকে শক্ত করে ধরে বললো–আরমান, একটু পা পিছলে গেলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। আমাকে ভালভাবে ধরে রাখো।

বনহুর আর আরমান তাকালো চারদিকে। পর্বতমালার যে শৃঙ্গ দিয়ে অগ্নি উদগীরণ হচ্ছিলো তা কিছুটা প্রশমিত হলেও এখনও গলিত লাভা এবং পাথরখন্ড বেরিয়ে আসছিলো আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর হতে। যদিও এ শৃঙ্গ হতেও শৃঙ্গ বহুদূরে তবুও অগ্নিতাপ এসে লাগছিলো বনহুর আর আরমানের শরীরে।

আরমান এ দৃশ্য কোনোদিন দেখেনি তাই তার দুচোখে বিস্ময় ভয় আর দুশ্চিন্তার ছাপ।

বনহুর দেখলো গলিত লাভা পর্বতশৃঙ্গ হতে গড়িয়ে পর্বতের পাদমূল প্লাবিত করে দিয়েছে। এ অঞ্চলে যদি লোকালয় থাকতো তাহলে আজ কেউ রক্ষা পেতো না, সবাই গলিত লাভার নিচে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করতো। তবে যে সব জীবজন্তু পর্বতমালার পাদমূলে গহন জঙ্গলে বাস করতো তারা কেউ রেহাই পায়নি। আরও দেখলো বনহুর যে স্থানে তারা এখন দাঁড়িয়ে আছে তা সম্পূর্ণ অপরদিক। পর্বতমালার সুউচ্চ শৃঙ্গে দাঁড়িয়েও তা ভালভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলো।

রহমান আর শিবনাথ তবে কি এখনও সেই ফাটলের ধারে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে? না আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড বিস্ফোরণে তারাও মৃত্যু বরণ করেছে। রহমান আর শিবনাথের অশ্ব দুটি কি তাহলে গলিত লাভার নিচে চাপা পড়ে গেছে? কিছু ভাবতে পারছে না বনহুর, সব যেন কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

ঠিক ঐ সময় বনহুর দেখলো তাদের অদূরে একটা পাথর দুলছে। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক নয় এ মুহূর্তে, কারণ আগ্নেয়গিরির প্রচন্ড বিস্ফোরণে সমস্ত পর্বতমালার অবস্থা শোচনীয়। এখনও মৃদু কম্পন হচ্ছে এবং পাথরখন্ড খসে পড়ছে। কিন্তু যে পাথরটা দুলছে, তা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

বনহুর আরমানকে শক্ত করে ধরে বললো–ঐ পাথরটা এক্ষুণি খসে পড়বে এবং আমাদের দিকে গড়িয়ে আসতে পারে।

বনহুরের কথা শেষ হয় না, প্রকান্ড পাথরটা খসে পড়লো এবং তাদের দিকে গড়িয়ে আসতে লাগলো। বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আরমানসহ সরে দাঁড়াতে গেলো, কিন্তু হঠাৎ পা পিছলে আরমান পড়ে যাবার উপক্রম হলো।

খপ করে ধরে ফেললো বনহুর ওর হাতখানা।

ভাগ্যিস ধরে ফেলার সুযোগ পেলো বনহুর তাই রক্ষা, নইলে আরমানকে আর খুঁজে পাওয়া যেতো না কোনোদিন। কিন্তু এমন ঝুলন্ত অবস্থায় কতক্ষণ রাখা যায়? বিরাটাকায় পাথরটা গড়িয়ে চলে গেলে নিচের দিকে।

বনহুর দৃঢ়হস্তে ধরে আছে আরমানকে।

সমস্ত দেহটা ওর ঝুলছে।

হঠাৎ হাত খসে পড়ে গেলে একেবারে হাজার হাজার ফিট নিচে পাথর আর কঠিন মাটিতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে আরমানের দেহটা।

আরমান ঝুলন্ত অবস্থায় ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। তার শরীর বেয়ে ঘাম ঝরছে। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেছে আর বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই। কতক্ষণ লোকটা তাকে এভাবে ধরে রাখতে পারবে। লোকটা কে? আরমানের নামটাও ওর জানা আছে। এই ভয়ংকর বিপদ মুহূর্তে তাকে যে রক্ষা করলো সে সাধারণ ব্যক্তি নয়। কিন্তু এসব নিয়ে এখন আরমান ভাবতে পারে না। তবুও বিদ্যুৎগতিতে একবার কথাগুলো মনে হলো তার। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যেমন প্রিয়জনের কথা একবার মানসপটে ভেসে ওঠে, ক্ষণিকের জন্য তেমনি কিছু চিন্তাধারা আরমানের মনে বয়ে গেলো।

বনহুর তখন প্রাণপণে আরমানকে তুলে নেয়ার চেষ্টা করছে। আর বুঝি পারছে না সে। এবার হাতখানা তার অবশ হয়ে আসছে। নিজেও বুঝি পড়ে যাবে ওর সঙ্গে। গভীর খাদ, নিচে পাথুরের মাটি–কি ভয়ংকর অবস্থা।

বনহুর চিৎকার করে বললো–আরমান, তোমার অপর হাতখানাও আমাকে দাও......আমি তোমার এক হাত ধরে রাখতে পারছি না। শিগগির অপর হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দাও।

আরমান মরিয়া হয়ে চেষ্টা করতে লাগলো। সে অর্ধমৃত হয়ে পড়েছে। অপর হাতখানা তুলে ধরার চেষ্টা করতে লাগলো। বার বার আপ্রাণ চেষ্টা করে এক সময় আরমান অপর হাতখানা তুলে ধরতে সক্ষম হলো।

বনহুর এবার আরমানের দুখানা হাত নিজের দুহাতের মুঠায় চেপে ধরলো। তারপর সাবধানে তুলে নিলো ওকে।

আরমানকে বনহুর নিজের পাশে তুলে নেয়ার পর আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠলো তার মন। কিন্তু এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বনহুর যে, মুখে কোনো কথাই বলতে পারল না, শুধু আরমানের পিঠ চাপড়ে আদর জানালো।

আরমান খুশিই শুধু হয়নি, লোকটা তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করে নিলো বলে কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো তার সমস্ত অন্তর। কিন্তু তারও কণ্ঠনালী শুকিয়ে

কাঠ, একটি কথাও বলতে পারলো না। মৃত্যুমলিন মুখে ফুটে উঠলো একটা হাসির আভাস।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিশ্রামের পালা। যদিও সামান্য একটু জায়গায় তারা দাঁড়িয়েছিলো তবু এবার তারা বসে পড়লো।

এখন পর্বতমালার কম্পন সম্পূর্ণ থেমে গেছে।

মাঝে মাঝে অগ্নি উদগীরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে শোনা যায় বাতাসের সাঁ সঁ আওয়াজ।

বনহুর আর আরমান পুনরায় সেই গহ্বরে প্রবেশ করলো, যে গহ্বরে বৃহৎকায় জীবটা মরে পড়েছিলো। পর্বতমালার অভ্যন্তর বলা যায়। শুধু উপরিভাগ খোলা, তাই আকাশের কিছু অংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

আরমান আর বনহুর যখন পুনরায় সেই গহ্বরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ সময় একটা অদ্ভুত শব্দ কানে আসে। ফিরে তাকাতেই বনহুর আর আরমান দেখতে পেলো একটা লোক পাথরচাপা অবস্থায় গোঙাচ্ছে। এখনও লোকটা জীবিত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বনহুর আরমানকে লক্ষ্য করে বললো–তুমি এখানে বসো আরমান, আমি দেখি ওর কি অবস্থা।

আরমান ভালভাবে তাকিয়ে লোকটিকে দেখছিলো, সে বললো–এটা ঐ দলের লোক যে দল আমাকে হত্যা করার জন্য এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে নিয়ে এসেছে। ঐ দেখুন ওর দেহেও সেই রবার পোশাক।

বনহুর ততক্ষণে ওর পাশে যায় এবং পাথরটা সরিয়ে ফেলে। লোকটা ভীষণভাবে গোঙাচ্ছিলো, এবার সে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে। তবে তার একখানা হাত এবং পাজরের কয়েকখানা হাড় ভেঙে গিয়েছিলো।

ওকে পাথরচাপা থেকে সরিয়ে নিয়ে ওর সমস্ত দেহটা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো বনহুর পাঁজরের কয়েকখানা হাড় ভেঙে গেছে। নাকমুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বোধ হয় বাঁচবে না, তবু বনহুর ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে আরমানকে লক্ষ্য করে বললো–এসো আরমান।

কিন্তু বেশিদূর এগুনো সম্ভব হলো না। লোকটা বললো–আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমাকে শুইয়ে দাও। আমাকে পানি দাও......আমি তোমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ বলে দেবো। ঐ দিকে যাও, পথ পাবে.......

বনহুর ওকে অগত্যা কাঁধ থেকে নামিয়ে শুইয়ে দিলো গুহার মেঝেতে। বললো বনহুর–পানি পাবো কোথায়। পানি তোমাকে পান করাতে পারলাম না বন্ধু।

লোকটার খুব কষ্ট হচ্ছিলো।

কেমন যেন করছিলো সে।

মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোকটার শুধু পাঁজরের হাড়ই ভাঙেনি হয়তো বা হৃদপিন্ডটা থেতলে গেছে। মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, এবার হঠাৎ ওর চোখ দুটো স্থির হয়ে তারপর ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেলো।

বনহুর ওর মাথাটা এতক্ষণ হাতের উপর উঁচু করে ধরে রেখেছিলো, এবার মাথাটা নিচে রাখলো।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর, বললো–ও বিদায় নিয়ে চলে গেলো। চলো ওর নির্দেশমত যদি পথের সন্ধান পাই....

আরমান হতভম্বের মত তাকিয়ে দেখছিলো। লোকটার আচরণ বিস্ময়কর বটে। তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বলিষ্ঠ আর দীপ্তময় কত আপনজন যেন সে। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে আরমানের মন বনহুরের ওপর।

বনহুর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে–ও চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলো। আরমান, শত্রুপক্ষের লোক হলেও সে আমাদের মস্ত বড় উপকার করে গেলো। চলো দেখা যাক কোনো পথ পাওয়া। যায় কিনা।

বনহুর আরমানসহ অপর দিকে এগুতে শুরু করলো। যেদিক দেখিয়ে লোকটা বলেছিলো, ঐ দিকে যাও পথ পাবে। কথাগুলো এখনও কানের কাছে বাজছে তাদের সত্যি যদি পথ পাওয়া যায়।

কথাটা ও মিথ্যা বলেনি, বনহুর আর আরমান ওদিকে এসে দাঁড়াতেই তাদের সম্মুখে একটি চাকা জাতীয় বস্তু দেখতে পেলো।

দ্রুতহস্তে বনহুর চাকাটা ঘোরাতে শুরু করলো। বনহুর বুঝতে পারলো এই চাকার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো পথের সংযোগ আছে। সত্যই তাই হলো, বনহুর চাকাটা ঘোরাতেই একটি বিস্ময়কর সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো।

বনহুরের চোখ দুটো খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আরমানকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেই পথে প্রবেশ করলো! দ্রুত এগুতে লাগলো বনহুর আর আরমান।

উঁচু নিচু এবড়ো থেবড়ো পথ, তারপর জমাট অন্ধকার। প্রায়ই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো আরমান। বনহুরও বারবার হোঁচট খাচ্ছিলো। বনহুর আরমানকে শক্ত করে ধরে এগুচ্ছিলো। ভাগ্যিস্ বনহুরের কাছে ক্ষুদে টর্চ ছিলো তারই আলো ফেলে পথ দেখে নিচ্ছিলো।

অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে এমন সময় একটা মেশিনের শব্দ কানে এলো তাদের। বনহুর আর আরমান থমকে দাঁড়ালো, ফিরে তাকালো তারা অবাক চোখে দেখলো একটি ছিদ্রপথ দিয়ে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসছে। বনহুর সেই ছিদ্রপথে চোখ রেখে তাকালো ভিতরে। আরও অবাক হলো বনহুর দেখলো ভিতরে সুন্দর একটি গুহা। গুহায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। আলোকরশ্মি তারই ছটা। একটি বৃদ্ধ লোক চেয়ারে বসে কিছু করছে বলে মনে হলো। তার পিঠের দিকটা নজরে পড়ছিলো।

বনহুর আরমানকে বললো–এই আলোকরশ্মি বৈদ্যুতিক আলো থেকে আসছে।

অবাক কণ্ঠে বললো আরমান–বৈদ্যতিক আলো এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে এলো কি করে?

কিছুই আশ্চর্য নয় আরমান। কান্দাই পর্বতমালা এমন একটি পর্বত যার অভ্যন্তরে রয়েছে নানা ধরনের গুপ্তরহস্য ভান্ডার। চলো দেখা যাক ঐ গুহার মধ্যে প্রবেশের কোনো পথ পাওয়া যায় কিনা।

কিন্তু এই বিপদ মুহূর্তে ঐ গুহায় প্রবেশ করা কি আমাদের সমীচীন হবে?

বিপদ যখন আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে তখন নতুন বিপদে ভয় কি বলল? চলো দেখা যাক।

বনহুর আরমানসহ গুহার প্রবেশপথ সন্ধান করে চললো। পেয়েও গেলে কিছুক্ষণের মধ্যে, ছোট একটি পথ। সেই পথে প্রবেশ করবার পূর্বে ক্ষুদে পিস্তলখানা বের করে নিলো এবং উদ্যত করে এগুতে লাগলো বনহুর। তার পেছনে আরমান।

ছোট্ট গুহাপথ ধরে ভেতরে প্রবেশ করে একপাশে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো। যে স্থানে বনহুর আর আরমান দাঁড়ালো সে স্থান হতে গুহার সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বনহুর দেখলো একটি বৃদ্ধ লোক চেয়ারে বসে টেবিলে কোনো বস্তুর দিকে তাকিয়ে আছে, হাত দুখানা দিয়ে বস্তুটি ধরে আছে মজবুত করে।

বস্তুটি কি তা বোঝা যাচ্ছে না।

বৃদ্ধের চারপাশে নানা ধরনের মেশিনাদি রয়েছে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আসবাবপত্রও নজরে পড়লো তাদের। মেশিন চালু অবস্থায় আছে।

বনহুর বুঝতে পারলো লোকটি কোনো বৈজ্ঞানিক হবে এবং সে গভীর মনোযোগ সহকারে কাজ করছে। পর্বতমালার সমস্ত স্তরে ভীষণ আলোড়ন এবং বিস্ফোরণ তার মনকে বিচলিত করতে পারেনি এবং তাকে কর্মচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি।

কি করছে সে এমন গভীরভাবে? বনহুর অতি চাপাকণ্ঠে বললো–আরমান, তুমি এখানে অপেক্ষা করো আমি দেখি লোকটি কি করছে এবং তার উদ্দেশ্য কি?

আরমান মাথাটা কাৎ করে সম্মতি জানালো।

বনহুর পিস্তলখানা ঠিক রেখে অতি সন্তর্পণে লোকটার দিকে পা বাড়ালো।

আশ্চর্য লোকটা একভাবে তাকিয়ে আছে তার হস্তস্থিত বস্তুটার দিকে। পাশে নানা ধরনের তার এবং সুইচ রয়েছে। পাশের টেবিলে কাঁচপাত্র এবং সেই কাঁচপাত্র হতে মৃদু মৃদু ধুয়া নির্গত হচ্ছে। বনহুর আশ্চর্য হল এত বিপর্যয়ের মধ্যেও লোকটা তার কাজে অবিচল।

বনহুর ওর পাশে এসে পিস্তল তার পিঠে চেপে ধরলো–খবরদার, নড়বেন না।

বৃদ্ধ নিশ্চল।

বললো বনহুর–কে আপনি? এখানে কি করছেন জবাব দিন?

তেমনি নিশ্চুপ রইলো বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

লোকটার মাথায় রাশিকৃত ঝাকড়া চুল। চুলগুলো বয়সের তাড়নায় শুভ্র আকার ধারণ করেছে। এমন কি ভ্রুজোড়াও সাদা ধবধবে। পিঠখানাও কিছু বেঁকে গেছে।

বৃদ্ধ একচুলও নড়লোনা।

এবার বনহুর বৃদ্ধের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

বিস্ময়কর বটে। বৃদ্ধ যেমন ঝুঁকে টেবিলে কিছু করছিলো তেমনি রইলো। একবার মাথা উঁচু করে চেয়ে দেখলো না পর্যন্ত।

বনহুর বাম হাতে বৃদ্ধের দেহে ধাক্কা দিলো।

আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ চেয়ারসহ কাৎ হয়ে পড়ে গেলো গুহার মেঝেতে। বনহুর পিস্তলখানা পূর্বস্থানে রেখে বুদ্ধের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো এবং মাথাটা তুলে ধরার চেষ্টা করলো কিন্তু আশ্চর্য। বৃদ্ধের মাথাটা একটুও সোজা করা সম্ভব হলো না। বৃদ্ধ বহুক্ষণ পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। তার শরীর শক্ত কাঠ হয়ে গেছে একেবারে।

বনহুর আরমানকে লক্ষ্য করে বললো–এমন বিস্ময়কর মৃত্যু দেখিনি। লোকটা বহুক্ষণ আগে মরে গেছে অথচ তার চেহারা বা বসে থাকার ভঙ্গী দেখে বুঝবারই জো নেই যে সে মৃত ব্যক্তি।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং টেবিলের এপাশের ওপাশের সব কিছু পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো। আরমানও অবাক হয়ে সব দেখছে। একপাশে একটি মস্তবড় কাঁচপাত্র তার মধ্যে রয়েছে লালটকটকে কোনো তরল পদার্থ। বনহুর আগ্রাহান্বিতভাবে এগিয়ে গেলো সেই তরল পদার্থসহ কাঁচপাত্রটির দিকে। দুচোখ তার ললাটে উঠলো মুহূর্তে। বনহুর বুঝতে পারলো এই সেই রক্তপায়ী বাদুড়ের পরিচালক। এই কাঁচপাত্রটির মধ্যেই রয়েছে মাহা মাংলু আরও বহু অসহায়

মানুষের দেহের রক্ত। বৃদ্ধটি তার রক্ত সগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে স্থান নির্বাচন করেছে কান্দাই পর্বতমালার গহ্বরে। যেখানে কেউ তার সন্ধান পাবে না। হঠাৎ আপন মনে হেসে উঠলো বনহুর।

দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তাকালো আরমান। লোকটা কে? কিই বা তার পরিচয়? সবকিছু তার আশ্চর্যজনক লাগছে। যেমন বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি সুন্দর দীপ্তময়। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, দেহের শক্তিও অসাধারণ। সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না যখন মস্ত বড় বড় পাথরগুলো অনায়াসে ও সরিয়ে ফেলছিলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আরমান, এমন করে ও হাসতে পারে। কোনো দিন আরমান এমন হাসি শোনেনি। বড় অবাক লাগছে তার কাছে।

আরমানকে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বনহুর হেসে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললো–খুব আশ্চর্য হয়েছে এত বিপদেও আমার হাসি পায় কি করে, তাই না? অতি দুঃখে হাসি পাচ্ছে আমার, বুঝলে আরমান? ভাবছি বৃদ্ধ তার সাধনায় সফলকাম হতে পারলো না। অহেতুক কত মানুষের অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে ......কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় বনহুর।

আরমান ভীষণ অবাক হয়ে যায়। রক্তপায়ী বাদুড়, সে আবার কেমন? আরমানের মনে প্রশ্ন জাগে কারণ সে জানে না রক্তপায়ী বাদুড় সম্বন্ধে কোনো কথা।

বনহুর বুঝতে পারে আরমানের মনে প্রশ্ন জেগেছে রক্তপায়ী বাদুড়টা কি এবং কেমন। বললো বনহুর–আরমান, এ মুহূর্তে তুমি যা ভাবছো তার জবাব এখন পাবে না, কারণ এখানে আর বেশিক্ষণ বিলম্ব করা ঠিক হবে না। হয়তো বা আমাদের অবস্থাও ঐ বৃদ্ধের মত হতে পারে।

এবার আরমান বললো–এই বৃদ্ধের মৃত্যু ঘটার কারণ কি হতে পারে?

এই যে টেবিলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম দেখছো এর দ্বারাই এর মত ঘটেছে। আমি ওর শরীরে হাত স্পর্শ করার সময় অনুভব করেছিলাম বৃদ্ধের দেহে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হচ্ছে। ভাগ্যিস আমি একটি কাঠের উপরে পা রেখেছিলাম তাই বিদ্যুৎ আমার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। চলো এখানে আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

আরমান আর বনহুর যতদূর সম্ভব দ্রুত বেরিয়ে এলো বাইরে কিন্তু বিদ্যুচ্চালিত শব্দটা এখনও চলছে। বনহুর বললো–শব্দটা কোথা হতে আসছে ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আশেপাশে কোথাও কোনো মেশিন চলছে এবং সে মেশিনটি ঐ কক্ষের ভিতর হতেই চালিত হচ্ছে। আরমান, তুমি অপেক্ষা করো, আমি ভিতরে গিয়ে ভালভাবে সন্ধান করে আসি শব্দটা কিসের। ক্ষুধায় পিপাসায় এত বেশি কাতর হয়েছিলো আরমান যে, সে বেশি কথা বলতে সক্ষম হচ্ছিলো না। বনহুর বুঝতে পারে এবং তাকে একা রেখে যাওয়া সমীচীন মনে করে না, তাই সে বলে–এসো তুমিও যা হয় একসঙ্গে হবে।

বনহুর আর আরমান পুনরায় সেই গুহায় প্রবেশ করলো যে গুহায় বৃদ্ধটিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো। এবার ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো বনহুর শব্দটা কোথা হতে আসছে।

হঠাৎ দেয়ালে একটা তাক নজরে পড়লো বনহুরের। গুহার দেয়ালে এমন তাক এই প্রথম যেন নজরে পড়লো। সুন্দর একটি ফুলদানি সেই তাকের ওপর শোভা পাচ্ছে।

বনহুর ফুলদানিটা হাতে তুলে নিতে গেলো কিন্তু খুব শক্তভাবে আটকানো আছে ফুলদানিটা তাকের সঙ্গে। বনহুর ছাড়বার বান্দা নয়, সে জোর করে ফুলদানিটা তুলে নিলো।

ফুলদানীটা হাতে তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটলো। তাকটা উল্টে গিয়ে বেরিয়ে এলো একটি সুড়ঙ্গপথ।

আশায় আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি আরমানসহ সেই সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলো। এমন পথ আশা করেনি তারা। সুন্দর পরিস্কার পথ। আলো জ্বলছে, সুড়ঙ্গপথ আলোময়। এবার বুঝতে পারলে তারা যে শব্দটা শুনতে পাচ্ছে তা কোনো ডায়নামার শব্দ। যার দ্বারা বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে কান্দাই পর্বতমালার অভ্যন্তরে।

বনহুর আর আরমান পথ পেয়ে গেছে, আর তাদের ভাববার সময় নেই। তারা যতটুকু সম্ভব দ্রুত দৌড়াতে শুরু করলো।

সোজাসুজি মসৃণ পথ, পথটা ক্রমান্বয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে চলতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না, তাই তারা কিছু সময়ের মধ্যে অনেক পথ এগিয়ে এলো।

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বনহুর, সামনে মস্তবড় একটি ফাটল। পথখানা যেন কেটে দুভাগ করা হয়েছে। নিচে গভীর খাদ অথবা জলোচ্ছ্বাস। কি আছে নিচে কিছু বুঝবার জো নেই।

খাদের মধ্যে জমাট অন্ধকার।

বনহুর তাকালো আরমানের মুখের দিকে, চোখে তার হতাশার ছাপ ফুটে উঠেছে।

আরমানও কেমন যেন করুণ হয়ে পড়লো। ফাটলখানা হঠাৎ তাদের চলার পথ রুদ্ধ করে দিলো।

বনহুর বললো–এইবার আমরা বিরাট একটা সমস্যার সম্মুখীন হলাম।

সুড়ঙ্গপথের ফাটলটি এত বেশি প্রশস্ত যে, লাফিয়ে পার হওয়ার কোনো উপায় ছিলো না। ফিরে যাওয়াও চলবে না, তাতে মৃত্যু ঘটতে পারে। কারণ পর্বত গহ্বরে বেশিক্ষণ টিকে থাকা মুস্কিল।

বনহুর বললো–আরমান, পর্বত গহ্বরে সুড়ঙ্গপথের দেয়ালে কিছু শিকড় ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ঐ ঝুলন্ত শিকড়গুলোকে অবলম্বন করে এগুতে হবে। পারবে?

আরমান ভয়াবহ ফাটলের গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আরষ্ট হয়ে গেলো। শিকড়গুলোকে ধরে ঝুলে ঝুলে পার হওয়া তার পক্ষে কি সম্ভব হবে। তবু বললো আরমান–পারবো?

খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো বনহুরের চোখ দুটো। এমনি উত্তরই বনহুর আশা করেছিলো। অদৃষ্টে যা থাকে ঘটবে তা নিয়ে ভাবলে চলবে না।

বনহুর আরমানকে দেখিয়ে দিলো, শিকড় ধরে ঝুলে অপর আর একটি শিকড় ধরতে হবে এবং সেইভাবে ঝুলে ঝুলে ওপারে পৌঁছতে হবে।

আরমানকে শিকড়গুলো টেনে দেখিয়ে দিলো, কোনটা শক্ত হবে।

বনহুর নিজেও শিকড় ধরে ঝুলে পড়লো।

এবং একটির পর একটি শিকড় ধরে অতি সন্তর্পণে এগুতে লাগলো।

অত্যন্ত ভয়াবহ মুহূর্ত।

আরমানও সেইভাবে এগুচ্ছে, তার দেহ কাঁপছিলো, নিচের দৃষ্টি নিজকে হয়তো ধরে রাখতে পারবে না তাই সে নিচে তাকাচ্ছে না।

বনহুর ততক্ষণে ওপারে গিয়ে হাজির হলো।

ঠিক ঐ সময় আরমান মাঝামাঝি এসে হাজির হয়েছে। বনহুর ওপাশে গিয়ে স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছে আরমানের দিকে। কোনো ক্রমে এসে পড়লে হয়, বনহুরের বুকটাও টিপ টিপ করছে। আর বুঝি পারলো না, এবার হাত ফসকে পড়ে যাবে ফাটলটার গহ্বরে।

প্রতিটি মুহূর্তে বনহুর এক ভয়ংকর অবস্থার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

একেবারে নিকটে এসে গেছে আরমান ঠিক ঐ সময় একটা হাত ফাটলের মধ্য হতে বেরিয়ে এলো। প্রকান্ড সে হাতের থাবা।

বনহুর লক্ষ করলো আরমান তা দেখতে পায়নি। দেখতে পেলে হয়তো তক্ষুণি হাত দুটো শিথিল হয়ে পড়তো।

বনহুর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আরমানকে টেনে নিলো, আরমান তার নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিলো তাই রক্ষে। বনহুর আরমানকে টেনে নিয়েই বললো–এক মুহূর্ত দেরী করো না আরমান, ফাটলের মধ্যে ভয়ংকর একটা হাত……

আরমান দেখলো দুটি লোমশ হাত ফাটলের ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে।

বনহুর বুঝতে পারলো এটা সেই ধরনের জীব যে জীবটা বনহুরকে তাড়া করেছিলো। পরে যার মৃতদেহ পর্বত গহ্বরে দেখতে পেয়েছে বনহুর আর আরমান।

বললো বনহুর–শিগগির ছুটতে শুরু করো আরমান।

আরমান এতবেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে, তার একটু নড়বার ক্ষমতা ছিলো না, সে রীতিমত হাঁপাচ্ছিলো।

বনহুর ওকে একরকম প্রায় টেনেই নিয়ে চললো।

আরমানকে শক্ত করে ধরে ছুটছে বনহুর। জীবটা যদি ফাটল বেয়ে উপরে উঠে পড়ে তাহলে আর রক্ষা থাকবে না। বনহুর আর আরমানকে পিপড়ার মত পিষে হত্যা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হাত দুখানা বিশাল।

সেটা ভয়ংকর হিংস্র জীব জানে বনহুর।

পেছন ফিরে তাকাবার সময় তাদের নেই। প্রাণপণে ছুটছে ওরা দুজন।

কতক্ষণ একটানা ছোটার পর বনহুর শীতল বাতাস অনুভব করলো। অনুমান করতে পারছে তারা এবার পৃথিবীর আলোর পরশ পাবে। হয়তো বা মুক্ত আকাশের তলায় পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

যা ভেবেছে বনহুর তাই সত্য, কিছু সময়ের মধ্যেই বনহুর আর আরমান এসে দাঁড়ালো প্রশস্ত এবং সমতল এক জায়গায়। মাথার ওপরে আকাশ, অসংখ্য তারার মালা জ্বলছে। বনহুর ও আরমান বুঝতে পারলে তারা পর্বতমালার অভ্যন্তর হতে মুক্ত স্থানে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এখন রাত তাও তারা অনুধাবন করলো। বনহুরের হাতের ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা অকেজো হয়ে পড়ায় কোনো সংবাদ সে কোথাও দিতে পারছে না।

বনহুর তাকালো গুহামুখটার দিকে। যে পথ ধরে তারা পর্বতের অভ্যন্তর হতে বেরিয়ে এসেছে সেই পথে জীবটা আসতে পারে। কিন্তু সুড়ঙ্গপথের এই মুখটা তেমন প্রশস্ত নয়, কাজেই কতকটা নিশ্চিন্ত হলো বনহুর। আরমানকে কথাটা বুঝিয়ে বললো–আরমান এবার তুমি বিশ্রাম করতে পারো, কারণ এ স্থানটি আমার কাছে নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে। যদিও সেই বিশাল দুটি হাতের অধিকারী আমাদের পেছনে ধাওয়া করেছিলো, সে এতদূর এসে পৌঁছতে সক্ষম হবে না, কারণ সুড়ঙ্গপথটির শেষ অংশ মোটেই প্রশস্ত নয়। আমাদের মাথাই প্রায় ছাদে

ঢুকে যাচ্ছিলো। কাজেই তুমি কিছু ভেবো না আরমান, আপাতত আমরা নিশ্চিন্ত। তবে ঠিক এখানে থাকাটাও ঠিক নয়, চলো আমরা গুহামুখ হতে কিছুটা দূরে সরে যাই।

চলুন। তাই চলুন।

তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাই না? ক্ষুধা-পিপাসা তোমাকে কাহিল করে ফেলেছে। শুধু তোমাকেই নয়, আমাকেও কাবু করেছে আরমান।

আরমান নিশ্চুপ, ভাবে সে–লোকটা অদ্ভুত বটে। তার ক্ষুধা-পিপাসাও কম নয়, তবুও সে একটুও কাহিল হয়নি। তার যে শক্তির পরিচয় আরমান পেয়েছে তা সে কোনোদিন ভুলবে না।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলো বলে অনেকটা পথ সরে এলো তারা সেই গুহামুখ থেকে। লোকটা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বনহুরকে পথের সন্ধান দিয়ে গেলো বলেই না এত সহজে তারা মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়াতে সক্ষম হলো?

পর্বতের কোল ঘেঁষে বসলো বনহুর আর আরমান। তখনও পর্বতমালার সেই আগ্নেয়গিরির অংশমুখ থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিলো তবে পূর্বের মত নয়, বিস্ফোরণ আর প্রচন্ড শব্দ এখন ছিলো না।

বনহুর আরমানকে লক্ষ্য করে বললো–আরমান, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও। আমি জেগে আছি তোমার শিয়রে।

তা হয় না, আপনি ঘুমান, আমি বরং……

হেসে বললো বনহুর–তুমি ছেলেমানুষ, কষ্ট পেয়েছে অনেক। জাগতে পারবে না ঘুমিয়ে পড়ো।

বনহুরের কথার মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠতার ছাপ ছিলো যার দরুন আরমান কোনো জবাব দিতে পারলো না। সে একটা উঁচু টিলার সঙ্গে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়লো।

বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। যদিও ক্লান্তিতে দুচোখ বন্ধ হয়ে আসছিলো তবু বনহুর

ঘুমালো না, সে বসে রইলো টিলায় হেলান দিয়ে।

এক সময় রাত ভোর হয়ে এলো।

গোটা রাত ধরে নানা রকম চিন্তা বনহুরের মনে জট পাকাচ্ছিলো। না জানি রহমান আর শিবনাথ কোথায়। তারা কি মৃত্যুবরণ করেছে না জীবিত আছে কে জানে। মনে পড়লো জাভেদের কথা, এখনও কি জাভেদ আস্তানায় ফিরে আসেনি। জাভেদটা হঠাৎ করে গেলো কোথায়?

কত রকম চিন্তা আসছে তার মাথায়। এক সময় তন্দ্রা এসেছিলো চোখে, হঠাৎ পাখি ডাকার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে বনহুরের। চোখ মেলে দেখলো ভোর হয়ে গেছে। আরমান তখনও ঘুমাচ্ছে। বনহুর নির্বাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো, আহা, বেচারা, কত কষ্টই না তাকে সহ্য করতে হলো। নূরকে ভালবাসে সে এবং সেকারণেই আরমানকে এ কষ্ট মেনে নিতে হয়েছে। কান্দাই পুলিশমহল আরমানকে খুঁজে ফিরছে হন্যে হয়ে। নূর নিজেও বন্ধুর সন্ধানে নাওয়া খাওয়া ছেড়েছে। সব জানে বনহুর। আরও জানে, মনিরাও আরমানের জন্য শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে, কারণ আরমান নূরের জন্য অনেক করেছে। আজ ভাগ্য যদি তাকে এভাবে এই পর্বতগুহায় টেনে না আনতো তাহলে আরমানকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব হতো না। ওকে ওরা হত্যা করতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা কারা? কিন্তু এখন সে কথা নিয়ে ভাববার সময় নেই।

আরমান জেগে উঠলো।

আবার শুরু হলো পথচলা। পর্বতমালার পাদদেশের কাছাকাছি এসে পড়েছে তারা। নিচে গভীর জঙ্গল ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না।

বনহুর আর আরমান নামতে শুরু করলো। একবার পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, এই শৃঙ্গের অভ্যন্তরে কত রহস্য লুকিয়ে আছে......

এক সময় বনহুর আর আরমান পর্বতমালার পাদদেশে এসে পৌঁছে গেলো। ঘন জঙ্গলে আচ্ছন্ন পর্বতমালার এদিকটা। আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ধাক্কা এদিকে এসে পৌঁছায়নি বলে মনে হলো। কারণ গলিত লাভা কিংবা বিধ্বস্ত পাথরখন্ডের স্তূপ একদিকটায় তেমন নেই। ঘন জঙ্গল পাখি এবং হরিণ নজরে পড়লো প্রথমেই।

বনহুরকে বেশ প্রসন্ন লাগছে।

বললো বনহুর–হয়তো বা এই জঙ্গলে সুস্বাদু ফল পাওয়া যেতে পারে এবং পানি মানে ঝর্ণা। থাকতে পারে। উঃ! বড় পানির পিপাসা পেয়েছে।

আরমান শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁটখানা একবার চেটে নিলো। পানি, নামটা শুনতেও বড় ভাল লাগছে। একটা গাছের নিচে এসে বসলো ওরা দুজন।

সূর্যের প্রখর রৌদ্রের তাপ এখানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। বেশ মিষ্টি হাওয়া দেহটাকে শীতল করে দিলো।

বনহুর বললো–আরমান, তুমি এখানে বসো আমি পানি এবং ফলের সন্ধান করে আসি।

আরমান বললো–আপনি বরং বিশ্রাম করুন, আমি দেখে আসি। তা হয় না আরমান, তুমি বড় ক্লান্ত, আমি যাবো এবং ফিরে আসবো।

বনহুর চলে যায়।

আরমান নিশ্চুপ বসে রইলো। গহন বনে একাকী তার মোটেই ভাল লাগছে না, কারণ চারদিকে নানা ধরনের বিপদের ঘনঘটা। ভয়ংকর জীবজন্তু আক্রমণ করা অস্বাভাবিক নয়।

হঠাৎ আরমানের কানে আসে মানুষের কণ্ঠস্বর। নির্জন বনে মানুষের কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য বটে। ভীত হলো আরমান, তবে কি আবার কোনো শত্রুপক্ষ তাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে?

হয়তো বা তাই হবে।

আরমান একটা ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে পড়লো।

দেখলো দুজন লোক জঙ্গলের দিকে এগিয়ে আসছে। ভীত আতঙ্কিত হয়ে উঠলো আরমান, গভীর মনোযোগ সহকারে দেখছে।

দুজন লোক, নিজেরা কথোপকথন করতে করতে এগুচ্ছে। তাদের চাহনিতে সন্ধানী দৃষ্টি, কোন কিছুর সন্ধান করছে তারা। ওরা আরও এগিয়ে এলো আরমান

দেখলো তাদের মধ্যে একজনের একটি হাত নেই। লোকটার চেহারা বলিষ্ঠ, শরীরে উভয়েরই এক রকম পোশাক।

আরমান ওদের কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনতে চেষ্টা করলো। আরও অনেক এগিয়ে এসেছে ওরা। আরমান আড়াল থেকে সব শুনতে পাচ্ছে। ওদের একজন বললো–এই জঙ্গলে থাকতে পারে।

অপরজন বললো–এ দিকে আসেনি, যতদূর সম্ভব ওরা আস্তানায় ফিরে গেছে।

কিন্তু আমার মনে হয় ওরা দুজন পর্বতের আশেপাশেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে মনের আনন্দে বিচরণ করে ফিরছে।

আরমান আশংকিত হলো, তবে কি তাদের দুজনের কথা বলছে। এরা কি তবে সেই দলের লোক যে দল তাকে বন্দী করে এনে নির্মমভাবে শাস্তি দিচ্ছিলো। ভয়ার্ত মনে প্রতীক্ষা করতে লাগলো, ওরা যদি দেখে ফেলে তাহলে কি হবে তখন।

একেবারে নিকটে এসে দাঁড়ালো ওরা।

রৌদ্রের তাপে ওদের শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছিলো। তাই তারা সেই বিরাট গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ একজনের কণ্ঠ শুনতে পেলো আরমান, এখানে সিগারেটের টুকরা এলো কি

তাইতো, এখানে সিগারেটের টুকরা। এ যে দেখছি সদ্য সেবন করা হয়েছে। এ কণ্ঠ অপরজনের বেশ বুঝতে পারলো আরমান।

দুব্যক্তিই বিস্ময় প্রকাশ করছে কি করে এই গহন বনে নির্জন পর্বতমালার পাদমূলে সদ্য পান করা সিগারেটের অর্ধদগ্ধ টুকরা এলো।

আরমান বুঝতে পারলে তারা এখানে বসে যখন বিশ্রাম করছিলো তখন তিনি সিগারেট পান। করেছিলেন এবং এটা সেই সিগারেটের টুকরা ছাড়া কিছু নয়। আরমান ভীত হলো, তবে কি ওরা তার সন্ধান করবে। যদি আবার সে ওদের হাতে ধরা পড়ে যায় তখন কি হবে…আরমান আরও জড়োসড়ো হয়ে লুকিয়ে পড়লো, যেন তাকে ওরা দেখতে না পায়। আরমান আত্মগোপন করলে কি হবে তার কানটা সজাগ ছিলো। ওরা যে কথাবার্তা বলছে তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সে। ওরা বেশ কিছুক্ষণ সিগারেটের টুকরা নিয়ে আলাপ করলো। এবার আরমান শুনতে

পেলো ওদের একজনের কথা, বলছে সে–কান্দাই পর্বতমালার অভ্যন্তরে এমনভাবে সর্দার হারিয়ে যাবে ভাবতে পারিনি। আগ্নেয়গিরি তাকে গ্রাস করেছে, আর কোনোদিন আমরা সর্দারকে ফিরে পাবো না…

ব্যথায় কণ্ঠ ধরে আসে লোকটার।

অপর ব্যক্তি কাদো কাঁদো স্বরে বললো–ভাই, আমি আগেই বলেছিলাম দেবতা ক্ষেপেছে তাই তার মুখ দিয়ে আগুন বের হচ্ছে। সব ধ্বংস করে দিলো, তার সঙ্গে হারালাম আমাদের সর্দারকে।

আরমান ভাবছে, সর্দার সে আবার কে? নিশ্চয়ই, সেই দলের লোক, না হলে সর্দারের কথা স্মরণ করছে কেন? সর্দার তার কয়েকজন সাথী–সঙ্গী নিয়ে মরেছে আর তারা ফিরে আসবে না। আরমান নিজের চোখে এসব মৃতদেহ বিকৃত মাংসপিন্ডের ন্যায় দেখেছে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা আনন্দধ্বনি শোনা গেলো। আরমান ঝোঁপটার মধ্য হতে ভালভাবে তাকালো, বিস্ময়ে হতবাক হলো সে। দেখলো আরমান তার উদ্ধারকারী সেই ব্যক্তি ফিরে এসেছে। তাকে দেখতে পেয়ে ওরা ভীষণভাবে আনন্দ প্রকাশ করছে। ওরা কুর্ণিশ জানিয়ে গদগদ কণ্ঠে বললো–সর্দার আপনি এখানে……

প্রায় দুজনই একসঙ্গে তাকে অভিবাদন জানালো এবং একই সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করছে। আরমান দেখলো ওরা তাকে পেয়ে যেমন আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েছে তেমনি তিনিও খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছেন, বললেন–তোমরা বেঁচে থাকো। সত্যি আমি তোমাদের জন্য ভীষণ চিন্তিত ছিলাম।

সর্দার, আমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আপনাকে হারিয়ে আমরা পাগল প্রায় হয়ে পড়েছি। কথাটা বললো রহমান।

শিবনাথ উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললো–আমরা আপনাকে ফিরে পাবো সে আশা আমাদের ছিলো না সর্দার। আমরা কি যে খুশি হয়েছি আপনাকে পেয়ে তা বুঝিয়ে বলতে পারছি না। আপনি কিভাবে পর্বতের গহবর থেকে উদ্ধার পেলেন সর্দার?

বনহুর শিবনাথ এবং রহমানের মুখভাব লক্ষ্য করে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে, তারা তাকে ফিরে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছে। একটু ভেবে বললো বনহুর–সব পরে বলবো। আচ্ছা, তোমরা এখানে আর একজনকে দেখতে পেয়েছো? একটা তরুণকে,..

রহমান বললো–না, আমরা এখানে কাউকে দেখিনি সর্দার। শুধু এখানে এক টুকরা সিগারেটের শেষ অংশ পেয়েছিলাম এবং তখন অনুমান করেছিলাম এখানে কোনো মানুষ কিছুক্ষণ পূর্বে ছিলো, কারণ সিগারেটের টুকরাটা সদ্য পান করা বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু কে সেটা পান করেছে এ সম্বন্ধে কোনো রকম অনুমান আমরা করতে পারিনি। সর্দার, আমরা আপনার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। যে পর্বতের মুখ দিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার এবং গলিত লাভা উদগীরণ হচ্ছে তার অভ্যন্তরে কি করে কেউ জীবিত থাকতে পারে। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে চলেছিলাম কিন্তু আমাদের অশ্ব দুটিও পাওয়া যাচ্ছে না, তাই আমরা আমাদের অশ্ব দুটির সন্ধানে এখানে এসে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করলাম…..

কিন্তু আমার মনে হয় না তোমাদের অশ্ব দুটি এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে। হয়তো বা ওরা গলিত লাভার তলায় চাপা পড়ে গেছে।

বললো শিবনাথ–আমারও তাই মনে হয়।

রহমান বললো–অশ্ব দুটি হারিয়ে গেলেও দুঃখ নেই। আপনাকে আমরা ফিরে পেয়েছি এটাই পরম সৌভাগ্য। সর্দার, চলুন আস্তানায় ফিরে যাওয়া যাক।

বনহুর চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো–আরমান গেলো কোথায়? ওকে আমি এখানে রেখে গেছি। ও বড় ক্ষুধার্ত, তাই ওকে এখানে রেখে কিছু ফলের সন্ধানে গিয়েছিলাম। ফল নিয়ে ফিরে এলাম কিন্তু ওকে দেখছি না… বনহুর প্যান্টের পকেট থেকে কয়েকটা ফল বের করে রহমানের হাতে দেয়, তারপর বলে–দেখি ওকে খুঁজে পাই কিনা।

বনহুর কয়েক পা এগুতেই আরমান আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। মুখে কোনো কথা নেই, সব দেখে সে একেবারে নির্বাক হয়ে গেছে যেন।

আরমানকে দেখামাত্র বনহুর একরকম প্রায় ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বললো–কোথায় ছিলে আরমান?

বললো আরমান–এখানেই ঐ ঝোঁপটার আড়ালে ছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমি বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম কারণ ওদের আমি চিনি না…

আরমান হাত দিয়ে রহমান আর শিবনাথকে দেখিয়ে বললো।

বনহুর বললো–এ জন্যই তুমি আড়ালে আত্মগোপন করেছিলে?

হাঁ

রহমান আর শিবনাথ অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আরমানের দিকে।

বনহুর বললো–যে ফাটলটির মধ্যে আমি প্রবেশ করেছিলাম তারই অভ্যন্তরে পাওয়া গেছে ওকে। সে অনেক কথা, পরে সব জানাবো তোমাদের।

সর্দারের কথার পর কোনো কথা বলার মত সাহস রহমান বা শিবনাথের ছিলো না।

সবাই মিলে বেরিয়ে এলো জঙ্গল থেকে।

*

হুমায়রা ছুটে এলো আশার পাশে, রীতিমত সে হাঁপাচ্ছে। চোখে মুখে তার উত্তেজনার ছাপ, একটা আনন্দের আভাসও দেখা যাচ্ছে সেই চোখ দুটোতে। বললো হুমায়রা–আশা আপুও এসেছে, ঐ শুনতে পাচ্ছো না ঘোড়ার খুরের শব্দ?

আশা কিছু করছিলো, হুমায়রাকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে আসতে দেখে তার মনে সন্দেহ জেগেছিলো, নিশ্চয়ই ও কোনো সংবাদ নিয়ে আসছে। আশার কানেও গিয়েছিলো সেই অশ্বপদ শব্দ। আজ নতুন নয়, মাঝে মাঝে শিকারিগণ এ পথ দিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চলে যায়, তখন আশা কুটিরে বসে শুনতে পায় অশ্বখুরের আওয়াজ। তাই আজও সে আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু হুমায়রা যখন চঞ্চল হরিণীর মত দৌড়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে তখন কিছুটা অবাক হলো আশা, বললো–কে এসেছে হুমা?

আশা হুমায়রাকে আদর করে হুমা বলতো। হুমা বলে ডাকলে হুমায়রা খুশি হতো।

আশার কথায় বললে হুমায়রা–আমার ইন্দ্রনাথ এসেছে।

ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ মানে জাভেদ, জাভেদ এসেছে।

হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি ও অশ্ব নিয়ে এদিকে আসছে।

সত্যি।

হ্যাঁ সত্যি।

চল দেখি।

চলো আশা আপু।

হুমায়রা আর আশা বেরিয়ে এলো কুটিরের বাইরে। অবাক চোখে দেখলো তারা, জাভেদ অশ্বের লাগাম ধরে কুটিরের দিকে এগিয়ে আসছে। শুনেছিলো আশা, জাভেদ নাকি এখন স্বাভাবিক জ্ঞানশূন্য, তার কোনো স্মরণ শক্তি নেই। আশা ভাবলে হয়তো বা জাভেদের স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে এসেছে। এখন হয়তো বা সে সুস্থ।

কিন্তু যখন জাভেদ কুটিরের নিকটে পৌঁছলো তখন সে কাউকে চিনতে পেরেছে বলে মনে হলো না। জাভেদ দক্ষিণ হাতে অশ্বের লাগাম চেপে ধরে বললো–আমাকে পানি পান করাতে পারো? আমি বড় ক্লান্ত……

আশা বললো–জাভেদ, তুমি আমাকে চিনতে পারছো না? আমি তোমার আশা আম্মু।

জাভেদের দুচোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে, অবাক হয়ে তাকিয়ে মাথা নাড়ে, না আমি তোমাদের চিনি না।

হুমায়রা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে ওঠে–আমাকেও তুমি চিনতে পারছে না? আমি–আমি হুমায়রা। নিজের বুকে হাত দিয়ে বলে হুমায়রা।

জাভেদ নিশ্চুপ।

সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আশা আর হুমায়রার দিকে।

হুমায়রা এবার ছুটে যায় এবং একপাত্র পানি নিয়ে ফিরে আসে। বলে সে–এই নাও পানি।

জাভেদ হাত বাড়িয়ে পানির পাত্র গ্রহণ করে।

পানি পান করে পানির পাত্র হুমায়রার হাতে দেয়, তারপর পা বাড়ায় তার অশ্ব জাম্বুর দিকে। আশা দ্রুত পথ আগলে দাঁড়ায়, বলে সে–জাভেদ, তুমি কি হয়ে গেছে বলোতো? আমি তোমার আশা আম্মু। আমাকে তুমি চিনতে পারছে না?

জাভেদ কোনো কথা বলে না, সে একবার আশা একবার হুমায়রার মুখের দিকে তাকায়। সে কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না এদের দুজনের কথা।

হুমায়রা অভিমানে মুখখানা ভার করে রইলো, সে আর কোনো বাক্যালাপ করছে না, দুচোখ তার অশ্রু ছলছল হয়ে উঠেছে।

আশা বললো–জাভেদ, তোমার কি হয়েছে? এসো ভিতরে এসো তুমি.......আশা জাভেদের হাত ধরে জোর করে প্রায় নিয়ে এলো। জাভেদ বাধ্য সন্তানের মত এলো আশার হাতে হাত রেখে।

বসিয়ে দিলো আশা ওকে নিজের বিছানায়। আদর করে চুলগুলো সরিয়ে দিলো যত্ন সহকারে ললাট থেকে।

জাভেদ কিছু বলছে না।

তার দুচোখে বিস্ময়।

হুমায়রা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে অশ্রুধারা।

জাভেদকে আশা খেতে দিলো ফলমুল।

কারণ আশা জানে, বনহুরের মতই জাভেদও ফল খেতে ভালবাসে, তাই ঘরে যে ফলমুল ছিলো ঝুড়িতে করে এনে রাখলো জাভেদের সামনে।

জাভেদ কিন্তু কিছুতেই ফলের ঝুড়িতে হাত দিচ্ছে না।

সে অবাক হয়ে ভাবছে, এত আদর এরা কেন করছে তাকে। যখন জাভেদের হাতে হুমায়রা পানির গেলাস তুলে দিয়েছিলো তখন জাভেদের মনের একটা চিন্তাসস্রাত বয়ে চলেছিলো এ মুখ সে যেন কোথাও দেখেছে। এ কণ্ঠ সে যেন কোথাও শুনেছে। কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছে না কিছু।

আশা বেরিয়ে গেলো।

হুমায়রা ঝুড়ি হতে একটি ফল তুলে নিয়ে জাভেদের দিকে বাড়িয়ে ধরে–নাও।

জাভেদ গভীরভাবে ভাবতে থাকে ওকে কোথায় দেখেছে সে। কিন্তু স্মরণ করতে পারে না।

বারবার যখন হুমায়রা ফল হাতে ওকে খাবার জন্য বলছিলো তখন জাভেদ স্মরণ করতে চেষ্টা করছিলো তাকে পূর্বে কোথায় দেখেছে। ফলটা হাতে নিলো তারপর খেতে শুরু করলো সে। ফলটা খাওয়া শেষ হলে আর একটি ফল হুমায়রা তুলে দিলো জাভেদের হাতে।

খাওয়া শেষ হলে জাভেদ উঠে দাঁড়ালো বেরিয়ে যাবে বলে।

কিন্তু হুমায়রা তার পথ আগলে দাঁড়ালো–না, তোমাকে আমি যেতে দেবো না।

বললো জাভেদ–কেন? কেন যেতে দেবে না আমাকে

তুমি যে আমার ইন্দ্র, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। ভাল করে স্মরণ করে দেখো আমি তোমার কে?

জাভেদ পূর্বের ন্যায় নিশ্চুপ রইলো।

হুমায়রা ওর হাত ধরে আবেগভরা কণ্ঠে বলে–তুমি জানো না সেই সন্ন্যাসী বাবার ওখানে তুমি আর আমি কত হাসিখুশিতে ছিলাম তোমাকে সন্ন্যাসী বাবা নিয়ে গেলো, তারপর কতদিন তুমি ফিরে এলে না। আমি তোমার প্রতীক্ষায় সব সময় প্রহর গুনতাম। তুমি একদিন এলে তারপর সন্ন্যাসী বাবাকে হত্যা করলে, তারপর তুমি চলে গেলে। আর ফিরে এলে না।

জাভেদ নির্বাক।

বলে চলে হুমায়রা–তুমি জানো না তোমার জন্য আমি উন্মাদ হয়ে পড়েছিলাম। আর তুমি আমাকে ত্যাগ করে চলে যেও না। চলে যেও না ইন্দ্রনাথ……

হুমায়রা ওর পা দুটি চেপে ধরে।

জাভেদ কিছু বলে না, সে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। হয়তো তার মনের আকাশে ক্ষীণ প্রদীপশিখার মত ভেসে উঠছে হুমায়রার মুখখানা।

হুমায়রা কিছুতেই জাভেদকে আর যেতে দেয় না। নানাভাবে ওকে ধরে রাখে হুমায়রা আর আশা। তারা সব সময় ওকে চোখে চোখে রাখে যেন ও আর পালাতে না পারে।

দিনের পর দিন কেটে চলে।

জাভেদ এখন অনেকটা চিনতে পেরেছে হুমায়রাকে। তবে আশাকে সে আজও চিনতে পারলো না। আশার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। নীরবে কাঁদে আশা জাভেদের জন্য। আশা জাভেদকে পেয়ে ভুলে গিয়েছিলো বনহুরকে না পাওয়ার বেদনা। কিন্তু আজ জাভেদ তাকে চিনতে পারে না তাই তার ব্যথা–বেদনা বুকটাকে ভারী করে তোলে। তবু সান্ত্বনা জাভেদ আবার ফিরে এসেছে তার কুটিরে।

জাভেদ আর হুমায়রা যখন নির্জনে বসে একসঙ্গে কথা বলে তখন আশার মনে আনন্দের বান ডেকে যায়। কত যে খুশি লাগে, তার মনে পড়ে নিজের জীবনের কথাগুলো। বনহুরকে আশা অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলো, কিন্তু তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। বনহুর তার সৌম্য সুন্দর চেহারা আশাকে অভিভূতই শুধু করেনি তাকে সম্বিৎহারা করে তুলেছিলো। বহুবার আশা বনহুরকে পাশে পেয়েছে কিন্তু তবু তার মনে হয়েছে কত দূরে সে।

আশার জীবনে বনহুর সাধনা। কতবার আশা তাকে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে। মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছে আশা বনহুরকে। এ কারণে বনহুর কৃতজ্ঞ আশার কাছে।

অবশ্য আশা তা জানে, বনহুর তার ভালবাসাকে উপেক্ষা করেনি বরং সম্মান দিয়েছে। তাই বনহুর আশার কাছে এলে সে অনুগত ছাত্রের মত ব্যবহার করে। কথা বলে শান্ত গম্ভীর গলায়।

আশার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিলো জাভেদকে পেয়ে। নিজের সন্তানের মত মনে করতো সে তাকে

জাভেদকে সব সময় চোখে চোখে রেখেও ধরে রাখতে পারলো না আশা। একদিন তার। অজ্ঞাতে চলে গিয়েছিলো কোথায় কে জানে।

তারপর সে ফিরে এলো অনেক দিন পর।

কিন্তু সে তাকে চিনতে পারে না।

অবশ্য হুমায়রার মুখে সব কথা শুনেছিলো আশা। সন্ন্যাসী বাবাজীর রহস্যময় ওষুধে আজ জাভেদ সম্বিৎ হারা। কাউকে সে চিনতে পারে না, এমন কি আশাকেও না। আশার দুনয়নে অশ্রু ঝরে পড়ে, কেমন করে সে তাকে আবার পূর্বের মত করতে পাবে সেই ভাবনা অহরহ মনকে অস্থির করে তোলে।

হুমায়রা সন্ন্যাসী বাবার কাছে কিছু ওষুধ তৈরি করা শিখেছিলো, সে জানতো কোন ওষুধ তাকে সেবন করালে সে আবার পূর্বের সংজ্ঞা লাভ করবে। জেনেও সে ঐ ওষুধ জাভেদকে পান করায় নি, কারণ জানে হুমায়রা সংজ্ঞা ফিরে পেলে তাকে আর ধরে রাখা সম্ভব হবে না। যেমন সে এসেছিলো তেমনি আবার সে ফিরে যাবে তার সান্নিধ্য থেকে। হুমায়রার মনে এই ভয় ছিল যার জন্য সে জাভেদকে তার ইন্দ্রনাথ করেই রাখতে চায়।

মাঝে মাঝেই হুমায়রা গম্ভীর হয়ে ভাবে, সত্য আশা আপু জাভেদের পূর্ব স্মরণশক্তি ফিরে আনার জন্য কত না চেষ্টা করছে। বড় ব্যথা লাগে হুমায়রার মনে তবু সে চুপ করে থাকে, বেশ কিছুদিন কেটে যায়।

আশা আর হুমায়রা জাভেদকে একরকম বন্দী করে রাখার মতই রেখেছে। মুহূর্তের জন্য জাভেদ যেন দৃষ্টির আড়ালে না যায় সেইভাবে রেখেছে তারা। হুমায়রা যখন ঘুমায় আশা তখন। জেগে থাকে, আশা যখন ঘুমায় হুমায়রা তখন জাভেদের পাশে থাকে। রাতের অন্ধকারে যেন সে পালিয়ে না যায়।

অনাবিল শান্তি আজ আশার মনের গহনে, জাভেদ আজ তার কাছে রয়েছে। কেমন করে আশা ওকে সুস্থ করে তুলবে এ নিয়ে সব সময় চিন্তাভাবনা করে সে। হুমায়রার সঙ্গেও কথা বলে এ ব্যাপার নিয়ে।

হুমায়রা বলে–জানো আশা আপু আবার ও পূর্বের জ্ঞান লাভ করলে পালিয়ে যাবে। আর তুমি ধরে রাখতে পারবে না।

কে বললো হুমা তোকে এ কথা? জাভেদ আমার সন্তান না হলেও তাকে আমি নিজ সন্তানের মত মনে করি। সে কিছুতেই আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবে না যদি সে যায় আবার সে ফিরে আসবে। হুমা, তুই সত্যি লক্ষী মেয়ে, জাভেদকে তুই ধরে রেখেছিস তোর ভালবাসা দিয়ে। এ যে আমার কত আনন্দ......

একটু হেসে বলে হুমায়রা–কই আর পারলাম ওকে ধরে রাখতে। একবার শত চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারিনি, হারিয়ে গিয়েছিলো কোন অজানায়। এবারও যে পারবো তার কোন নিশ্চয়তা নেই, কখন সবার অজান্তে চলে যাবে আমরা কেউ জানবো না।

সত্যি বলেছিস হুমা, এমনি করে আমিও চেয়েছিলাম একজনকে ধরে রাখতে কিন্তু পারিনি......একটা দীর্ঘশ্বাস আশার বুক চিরে বেরিয়ে আসে, একটু থেমে বলে আশা–কত ব্যথা আমার বুকে তুই বুঝবি না হুমা?

সব বুঝি, আমিও যে তোমার মত আশা আপু জীবনে সব হারিয়েছি। জানি না কে আমার বাবা মা। গভীর জঙ্গলে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে লালিত পালিত হয়েছি। আদরযত্ন কোনোদিন পাইনি, শুধু পেয়েছি ব্যথা আর দুঃখ...সন্ন্যাসী বাবা আমাকে ভালবাসতেন কিন্তু সে ভালবাসায় প্রাণ ছিলো না। শুনেছি সন্ন্যাসী বাবা কোনো এক শহর থেকে আমাকে চুরি করে এনেছিলেন। তারপর যে ওষুধ আমার হাতে ইন্দ্রকে তিনি খাইয়েছিলেন, সেই ওষুধ আমাকেও পান করিয়েছিলেন, যেন কোনোদিন আমি তাকে ছেড়ে চলে না যাই। কিন্তু একদিন.....হঠাৎ থেমে গেলো হুমায়রা, সে বলতে যাচ্ছিলো, আমি একদিন সন্ন্যাসী বাবার কাছে গোপনে শিখে নেই কোন গাছের রস খেয়ে আবার পূর্ব সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া যাবে। আমি সন্ন্যাসী বাবার অলক্ষ্যে সেই গাছের শিকড়ের রস পান করি। তারপর আমার স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে পাই, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান লাভ করেও আমার কোনো লাভ হলো না, কারণ আমি খুব ছোট্টটি ছিলাম যখন আমি সন্ন্যাসী বাবার কাছেই তার আশ্রয়ে রয়ে গেলাম। তারপর হঠাৎ একদিন দেখা পেলাম ইন্দ্রনাথের। ঐ বনে আমি সন্ন্যাসী বাবা ছাড়া কোন মানুষ কাউকে দেখিনি। ইন্দ্রনাথকে আমার খুব ভাল লাগলো। সে পানি পান করতে চাইলে তাকে ইংগিত করেছিলেন সন্ন্যাসী বাবা। হুমায়রা বুঝতে পেরেছিলো তার ইংগিতের অর্থ তাই তখনই পানির সঙ্গে সেই ওষুধ পান করতে দিয়েছিলো হুমায়রা নিজের হাতে......না না, এসব কথা বলবে

না সে আশার কাছে। আশা তাহলে ইন্দ্রনাথকে পূর্বের সংজ্ঞা ফিরিয়ে দেবার জন্য তাকে অনুরোধ জানাবে। ইন্দ্র যদি পূর্বের সংজ্ঞা ফিরে পায়, তাহলে তাকে সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারবে না……

আশা বিচলিত কণ্ঠে বললো–কিন্তু একদিন কি? থামলি কেন হুমা? কি ভাবছিস তুই……

না না, আর তুমি কিছু জানতে চেও না আশা আপু, হয় তো সব হারাবো আমরা।

বেশ, যদি বলতে আপত্তি থাকে তাহলে বলিসনে, কারণ আমি চাই না তোর কোনো ক্ষতি হোক। আমি তোকে স্নেহ করি ভালবাসি অন্তর দিয়ে। যেমন ভালবাসি জাভেদকে। তোদের মঙ্গলই আমার জীবনের ব্রত। বনহুরের আর একটি দান–সে হলো তুই।

হুমায়রা আর আশা কথা হচ্ছিলো ঠিক ঐ সময় কেউ এসে দাঁড়ালো তাদের কুটিরের বাইরে।

আশা সজাগ ছিলো।

ইন্দ্রনাথ মানে জাভেদ কুটিরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। বাইরে কার পদশব্দ হলো, আশা বাইরে বেরিয়ে গেলো। দরজার বাইরে দন্ডায়মান রহমান স্বয়ং।

আশা রহমানকে চেনে তাই সে বলে উঠলো–তুমি।

হাঁ, আমি এলাম। সর্দার পাঠালেন হুমায়রার খোঁজখবর নেবার জন্য। কেমন আছে সে?

ভেতরে এসো রহমান।

আশা আর রহমান উঠানে প্রবেশ করলো। দেখলো হুমায়রা কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আশা রহমানসহ কুটিরে প্রবেশ করলো, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলো রহমান। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–জাভেদ এখানে।

জাভেদ ঘুমিয়ে ছিলো, রহমানের দৃষ্টি প্রথমেই তার ওপর পতিত হয়। জাভেদকে তারা খুঁজে ফিরছে দেশ হতে দেশান্তরে। কত জায়গায় না সন্ধান করেছে তবু জাভেদকে পায়নি। আজ আশার এখানে তাকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলো রহমান। সে ভাবতেও পারেনি আশার এখানে এসে জাভেদকে পাবে।

রহমান আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো।

আশা রহমানকে আনন্দমুখর হতে দেখে সেও খুশি হলো, ঠোঁটে আংগুল চাপা দিয়ে বললো–চুপ, বাইরে এসো, সব কথা বলবো।

রহমান আশার সঙ্গে বেরিয়ে এলো বাইরে।

বললো আশা–ওকে অনেক কষ্টে ধরে রেখেছি রহমান। পূর্বের সংজ্ঞা এখনও ওর ফিরে আসেনি, কেমন যেন খামখেয়ালী উদাসীন হয়ে পড়েছে। আমি চেষ্টা করছি ওর স্বাভাবিক সংজ্ঞা ফিরে আনার জন্য।

খুশি হলাম শুনে। বললো রহমান, আরও সে বললো–জাভেদ যেন আর পালাতে না পারে এদিকে ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার যেন সবার চোখে ধুলো দিয়ে চলে না যায়।

হেসে বলে আশা–রহমান, আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।

রহমান বিদায় নিয়ে চলে যায়।

সে তার নিজের অশ্ব নিয়ে এসেছিলো, অশ্ব নিয়েই ফিরে গেলো।

*

বনহুর পায়চারী করছিলো।

নূরী এসে দাঁড়ালো তার পাশে, চোখেমুখে তার গভীর দুশ্চিন্তা।

বনহুর নূরীর দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো। বললো সে–নূরী, কোথায় ছিলে তুমি?

সে সংবাদে তোমার দরকার কি? তুমি কোথায় ছিলো একদিন তাই বলো? আর রহমানই বা কোথায়?

নূরী, তুমি কিছু শোনোনি তাই এমনভাবে কথা বলছো। সব শুনলে অবাক হবে। কেমন করে জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি তা তুমি অনুমানও করতে পারবে না।

আমি শিবনাথের মুখে শুনেছি।

শিবনাথ তোমাকে সব কথা বলেছে?

হাঁ

তবে আবার কেন আমাকে প্রশ্ন করছো এ কদিন কোথায় ছিলাম। আর রহমানই বা কোথায়।

তোমার মুখে শুনতে চাই?

কেন শিবনাথের কথা তোমার বিশ্বাস হয়নি বুঝি?

হয়েছে।

তবে?

জানতে চাই সেই আরমান নামক ছেলেটি কে? এবং তাকে উদ্ধার করতে গিয়েই তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিলে।

তারপর?

তারপর তাকে তুমি নিজে তার বাসভবনে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলে ড্রাইভার বেশে।

শিবনাথ দেখছি সব কথা তোমাকে খুটিয়ে খুটিয়ে বলেছে।

হাঁ, সে সব কথা বলেছে।

রহমানকে কোথায় পাঠানো হয়েছে শুধু এই কথাটা শিবনাথ তোমাকে বলেনি দেখছি। আচ্ছা এর পেছনে ওর কি কারণ থাকতে পারে। একটু চিন্তা করে বললো বনহুর–শিবনাথ হয়তো কিছু গোপন করতে চায়।

সেটা কি গোপন করতে চায় তা তুমিই ভাল জানো হুর। সত্যি তুমি বড় ……

থামলে কেন, বলো আমি কি? খুব দুষ্ট, তাই না? শোনো, আমার কাছে কিছু লুকোতে চেও না। আমি সব জানি।

আমি তো তোমার কাছে কিছুই অজানা রাখিনি নূরী।

মিথ্যা কথা।

তাহলে বলো সত্যি কি?

তুমি আশার ওখানে একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখোনি?

অবাক হয়ে বললো বনহুর–নূরী, আজ আমি তোমার চোখে–মুখে যে ভাবধারা লক্ষ্য করছি তা আমি আশা করিনি। নূরী, সবাই আমাকে ভুল বুঝলেও তুমি আমাকে কোনোদিন ভুল বুঝবে না। বনহুর নুরীকে গভীর আবেগে টেনে নেয় কাছে।

নূরী বলে–আজকাল তুমি কেমন হয়ে গেছে।

নূরী!

হাঁ, তাই আমার ভয় হয় তোমাকে নিয়ে…..

তুমি কি বলতে চাও নূরী খুলে বল?

নূরী আর বনহুর শয্যায় পাশাপাশি বসলো। বনহুরের হাতের মুঠায় নূরীর একখানা হাত–ধরা রয়েছে।

বনহুর তাকিয়ে আছে নূরীর মুখের দিকে।

নূরীর দুচোখ মেঝেতে নিবদ্ধ।

বললো বনহুর–শিবনাথ তোমাকে যা বলেছে তা সব সত্য নাও হতে পারে, কারণ সে সব কিছু জানে না।

নূরী এবার চোখ তুলে বললো–তুমি একটি মেয়েকে আশার ওখানে রাখোনি?

হাঁ রেখেছি।

তুমি রহমানকে সেখানে পাঠিয়েছো সে কেমন আছে তার খোঁজখবর নিতে।

হাঁ, রহমান আশার ওখানেই গেছে।

মেয়েটি কে?

এক সন্ন্যাসীর কন্যা।

তার সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

কোনো সম্পর্কই তার সঙ্গে আমার নেই।

তবে এত খোঁজখবর নেবার দরকার কেন হলো? আর সন্ন্যাসীর কন্যা আশার ওখানে এলোই বা কি করে?

তোমাকে সব কথা বলার অবসর হয়নি বলেই বলা হয়নি নূরী। মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার কোনোরকম সন্দেহ থাকা উচিত নয়, কারণ সে একজন সন্ন্যাসী কন্যা তা ছাড়া……।

যাক, আমি আর কিছু জানতে চাই না। রহমান আর তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে জাভেদকে তোমরা খুঁজে বের করবে। কিন্তু তোমরা তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে।

না, আমরা নীরব হইনি। জাভেদের সন্ধান নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। কথাটা বলে এসে দাঁড়ালো রহমান। কুর্নিশ জানালো রহমান সর্দারকে নিয়মানুযায়ী।

বনহুর বললো–কি সংবাদ রহমান?

রহমানকে আজ বড় আনন্দমুখর লাগছে। হাস্যোদ্দীপ্ত মুখে বললো রহমান–সর্দার আশা এবং হুমায়রা মঙ্গল মতই আছে। আরও একটি সুসংবাদ জাভেদকে আমি আশার ওখানে দেখলাম......

সত্যি। সত্যি জাভেদ আশার ওখানে আছে ব্যাকুল আগ্রহে বললে নূরী।

বললো রহমান–জাভেদকে আশার ওখানে দেখবো ভাবতে পারিনি সর্দার।

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়েছে, কোনো কথা সে বললো না।

নূরী বললো–কি যে আনন্দ লাগছে আমার তোমাকে কি বলবো রহমান ভাই। সত্যি তুমি ওকে দেখেছো?

হাঁ দেখেছি।

কেমন হয়েছে? বড় শুকিয়ে গেছে বুঝি আমার জাভেদ

না, তেমন শুকিয়ে যায়নি। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে আমি দেখেছি।

নূরী আর রহমান যখন কথা হচ্ছিলো তখন বাইরে আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো ফুল্লরা। পিতাকে সে সর্দারের বিশ্রাম ঘরের দিকে আনন্দদ্দীপ্তভাবে যেতে দেখে পা টিপে টিপে এসে কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। না জানি তার বাপু কি সংবাদ বহন করে এনেছে। তবে তার মুখোভাব লক্ষ করে ফুল্লরা বুঝতে পেরেছিলো নিশ্চয়ই কোনো শুভ সংবাদই তার বাপু বহন করে এনেছে। কি সংবাদ হতে পারে, বিপুল আগ্রহ নিয়ে শুনতে চেষ্টা করে ফুল্লরা।

যখন ফুল্লরা জানতে পারলে তার জাভেদকে পাওয়া গেছে, তখন তার মন আনন্দে ভরে উঠলো। একটা ভীষণ দুশ্চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো–আর কোনোদিন সে জাভেদকে পাবে না। আজ জাভেদের সংবাদ পেয়ে খুশিতে উছলে উঠলো। সত্যি তাহলে জাভেদ জীবিত আছে এবং আশার ওখানে আছে।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে ফুল্লরা রওনা দিলো সবার অলক্ষে। অশ্বশালা হতে একটা অশ্ব নিলো সে।

বনহুর বা নূরীকেও জানালো না।

রহমান বা নাসরিন তারাও জানলো না। ফুল্লরা কাউকে না জানিয়ে চলে গেলো।

বনজঙ্গল পেরিয়ে, নদনদীর তীর ধরে ছুটে চললো তার অশ্ব।

ফুল্লরার মন থেকে মুছে গেছে ভয়ভীতি আর দুশ্চিন্তা। সে দুঃসাহসীর মত ছুটছে তার অশ্ব নিয়ে আশার কুটিরের সন্ধানে। ওখানে গেলেই পাবে সে তার জাভেদকে। এবার সে ওকে ফিরে নিয়ে এলে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির আড়াল করবে না। পালাতে দেবে না সে কোনমতেই আর

একসময় পথ হারিয়ে ফেলে ফুল্লরা।

আশার বাড়ির পথ যদিও তার জানা ছিলো তবুও কেমন যেন ভুল হয়ে যায়। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে ফুল্লরা। সে অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে হেঁটে পথের সন্ধান করে। সমুদ্রতীরে পথ সে হারিয়ে ফেলেছে।

এক জায়গায় অশ্ব রেখে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা দূরে সরে যায় ফুল্লরা।

এমন সময় একটি মোটরোটসহ কয়েকজন অবাঙালি দুস্কৃতিকারী ফুল্লরার পাশে বোট রেখে নেমে পড়ে তাকে জোর করে তাদের বোটে তুলে নেয়।

ফুল্লরা চিৎকার করে কিন্তু ওরা তাড়াতাড়ি বোট ছেড়ে দেয়।

ফুল্লরা সাধারণ মেয়ে নয়, সে হিংস্র সিংহীর মত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে।

ফুল্লরার কোমরে একটি সূতীক্ষ্ণ ছোরা সব সময় থাকতো। অবশ্য এ নিয়ম তাদের সবার। নূরী এবং নাসরিন যখন বাইরে বের হয় তাদের কোমরেও বাঁধা থাকে।

ফুল্লরাকে নিয়ে মোটর বোটখানা যখন স্পীডে যাচ্ছিলো তখন ফুল্লরা চারদিকে তাকিয়ে দেখলো, সে নিজকে প্রস্তুত করে নিলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। ক্রুদ্ধ সিংহী যেমন ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর তেমনি ফুল্লরা ভীষণভাবে আক্রমণ করলো দুস্কৃতিকারীদের।

সূতীক্ষ্ণধার ছোরা সমূলে বিদ্ধ করে দিলো একজনের পাঁজরে সঙ্গে সঙ্গে তুলে নিয়ে অপর জনের বুকে, তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে আর একজনের পিঠে।

দুস্কৃতিকারিগণ সজাগ হওয়ার পূর্বেই তিনজন নরপশুকে নিহত করলো ফুল্লরা। কিন্তু ছোরাখানা হাতছাড়া করলো না সে।

দুস্কৃতিকারী যারা জীবনে বেঁচে আছে তারা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। একটি অবলা তরুণীর কাছে তাদের যেন বিরাট পরাজয় ভাবতেই পারেনি তরুণীটি তাদের ওপর এভাবে আক্রমণ চালাতে পারে। তার কাছে ধারালো অস্ত্র আছে এটাও তারা বুঝতে পারেনি। যদি তারা বুঝতো তাহলে তরুণীর কাছ থেকে তারা পূর্বেই অস্ত্র ছিনিয়ে নিতো। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলো ওরা এবং তরুণীর রূপে আত্মহারা হয়ে ফুর্তি শুরু করে দিয়েছিলো মনের আনন্দে।

ফুল্লরা উন্মাদিনীর মত রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মহাকান্ড শুরু করে দিলো। মরতে হয় মরবে তবু সে নিজের ইজ্জত দেবে না। ফুলের মত নিষ্পাপ সে, এ পৃথিবী থেকে ফুলের মতই পবিত্রভাবে ঝরে যাবে তবু সে ধরা দেবে না কাউকে। ফুল্লরা যেমন কোমল তেমনি কঠিন আর হিংস্র। তার দেহে শক্তিও কম ছিলো না। তাছাড়া জীবন রক্ষার্থে তার সংগ্রাম। মরিয়া হয়ে উঠেছে ফুল্লরা, হয় নিজকে রক্ষা করবে নয় মৃত্যুবরণ করবে, দুটোর একটা সে বেছে নেবে।

ফুল্লরার রুদ্রমূর্তি, হাতে সূতীক্ষ্ণধার ছোরা। ওরা কেউ সাহস পাচ্ছে না তাকে পাকড়াও করে। ফুল্লরার হাতের সূতীক্ষধার ছোরাখানা সূর্যের আলোতে ঝকমক করছে।

দুস্কৃতিকারিগণ ঘাবড়ে গেছে, কারণ আচমকা তরুণীটি তাদের আক্রমণ চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে বসবে তা তারা ভাবতেই পারেনি। তিনজনকে হত্যা করেছে সে, আর বাকি মাত্র তিন জন। সবাই মিলে তারা ছজন ছিলো মোটরবোটখানাতে। ওদের কাছে পিস্তল বা রিভলভার ছিলো না, তাই ওরা আরও বেশি কাবু হয়ে পড়েছে।

একজন সাহস করে ওকে পেছন থেকে ধরতে যায়।

কিন্তু ফুল্লরা অত্যন্ত সজাগ এবং চালাক মেয়ে, সে প্রস্তুত ছিলো ওকে যে যেদিক দিয়েই আক্রমণ করুক না কেন তাকে সে হত্যা করবেই। কিছুতেই তাকে

সে ছেড়ে দেবে না।

লোকটা ফুল্লরাকে জাপটে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে সমুদ্রের পানিতে পড়ে গেলো। খানিকটা পানি লাল হয়ে উঠলো ক্ষণিকের জন্য।

ফুল্লরা ওর পাঁজর ভেদ করে ছোরাখানা বসিয়ে আবার টেনে তুলে নিয়ে ছিলো।

এখন দুস্কৃতিকারীদের মধ্যে মাত্র দুজন অবশিষ্ট রইলো। মোটরবোট চালাচ্ছিলো একজন আর একজন ফুল্লরার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছিলো। ভাবছে এবার তার পালা। একটি তরুণীর কাছে তাদের চরম পরাজয়। সামান্য একটি তরুণী বলে তারা অবহেলা করে কোনো রকম প্রস্তুতি নেয়নি বা প্রস্তুত হয়নি, এবং সেই কারণেই তাদের এই চরম অবস্থা। এতগুলো জোয়ান পুরুষ হয়েও পারলো না কিছু করতে।

এবার ফুল্লরাই ওকে আক্রমণ করতে গেলো।

লোকটা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে, ফুল্লরা ওর দিকে এগুবোর সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো

যে লোকটা মোটরবোট চালাচ্ছিলো সেও প্রাণের ভয়ে হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে পড়লো সমুদ্রের গভীর পানিতে। এবার ফুল্লরা তাকালো আকাশের দিকে–হে মহান তুমি আছো, তাই…ছোরাখানা এবার সে কাপড়ের নিচে লুকানো খাপের মধ্যে খুঁজে রাখলো।

তাকালো তার পায়ের কাছে মোটরবোটের মেঝেতে পড়ে থাকা লাশগুলোর দিকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে মোটরবোটের মেঝে।

ফুল্লরা রক্তাক্ত লাশগুলোকে টেনে টেনে এক একটি করে পানিতে নিক্ষেপ করলো। ফুল্লরার দেহের বসন রাঙা হলো, শরীরের নানা স্থানে রক্তের ছোপ লাগলো। ফুল্লরা মোটরোট চালনা না জানলেও সে ঐ মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠলো। হ্যান্ডেলখানা শক্ত করে চেপে ধরলো।

মোটরবোট খানা স্পীডে ছুটে চললো দিশেহারার মত।

অসহায় ফুল্লরা।

কি করবে ভেবে পায় না।

সে তাকায় সমুদ্রতীরের দিকে। তার অশ্বটিকে দেখা যায় না। তীরও ঝাপসা লাগে তার দৃষ্টিতে। দুস্কৃতিকারিগণ তাকে বোটে তুলে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে অনেক দূরে চলে এসেছিলো।

ফুল্লরা দেখলো মোটরবোটটা তাকে নিয়ে গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। সমুদ্রের ভয়ংকর গর্জন আর প্রচন্ড ঢেউ তার মোটর বোটখানাকে গ্রাস করতে পারে। মোটরবোটখানা যদি তলিয়ে যায় তাহলে মৃত্যু অনিবার্য। সে মোটরবোট চালানো জানে না কাজেই ভীষণ ঘাবড়ে গেলো। ভরসা তার একমাত্র আল্লাহ।

কিন্তু তবু ফুল্লরা বিভ্রান্ত হয় না।

সে মোটরবোটের হ্যান্ডেল ঘোরাতে থাকে। সে ভালভাবে লক্ষ রাখলো কোন দিকে হ্যান্ডেল ঘোরালে মোটরবোটটা তীরের দিকে যায়। অবশ্য কিছুক্ষণ মোটরবোটখানা এলোপাতাড়ি এদিক ওদিক ছুটতে লাগলো। হঠাৎ এক সময় তীরের দিকে ছুটলো মোটরবোটখানা।

এবার ফুল্লরা একচুলও হাত নাড়ালো না। সে শক্ত করে ধরে রাখলো হ্যান্ডেল।

মোটরবোট তীরবেগে ছুটে চলেছে।

অল্পক্ষণেই তীরের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লো মোটরবোটখানা। ফুল্লরা স্পীড কমানো বা বাড়ানো কিংবা থামানো কিছুই জানে না সে যেমন হ্যাঁণ্ডেল চেপে ধরে বসেছিলো তেমনি বসে আছে।

মোটরবোটখানা ভীষণ বেগে তীরের দিকে ছুটে আসে।

হ্যান্ডেল ছেড়ে দিয়ে ফুল্লরা দুহাতে চোখ ঢেকে ফেলে, এবার আর সে রক্ষা পাবে না। মোটরবোটখানা তীরে বালুকারাশির উপরে উঠে আসে।

ছিটকে পড়ে ফুল্লরা বালুকাভূমির ওপর।

বালুকারাশির জন্য ফুল্লরা তেমন কঠিন আঘাত পায় না। তবু কিছুটা দুমড়ে যায় তার এক পায়ের হাটুখানা।

একটু জিরিয়ে নিয়ে উঠে বসে সে বালুকারাশির বুকে।

অদূরে কাৎ হয়ে পড়ে আছে মোটরবোটটা।

ফুল্লরা তাকায় সমুদ্রের দিকে। কি ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীনই না হয়েছিলো সে। সত্যি তার প্রতি আল্লাহতায়ালা সহায় ছিলেন তাই সে রক্ষা পেয়েছে। এতগুলো দুস্কৃতিকারীর কবল থেকে কি করে যে সে উদ্ধার পেলো ভাবার কথা। ফুল্লরা নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে কেমন করে সে এখনও জীবিত আছে। এতগুলো জোয়ানকে সে একা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়ায় তাকায় সে চারদিকে।

একদিকে সমুদ্রের অথৈ জলরাশি।

অন্যদিকে সীমাহীন বালুকাভূমি।

ফুল্লরার মনটা কেমন যেন দমে যায়। কোথায় তার অশ্বটি। অশ্ব না পেলে তার ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। পথ ভুল করে সে এসে পড়েছে দূরে অনেক দূরে। পায়ে হেঁটে সে যাবে কি করে? চারদিকে জনহীন প্রান্তর।

একটু একটু করে এগুতে শুরু করে ফুল্লরা।

তার সমস্ত শরীরে রক্তের ছাপ লেগে রয়েছে। চোখে মুখেও রক্ত লেগেছে, লেগেছে দেহের নানা স্থানে। এখন রক্ত শুকিয়ে গেছে। সমুদ্রের পানিতে হাত দুখানা ভালভাবে পরিষ্কার করে নেয় কিন্তু সমস্ত জামাকাপড়ে রক্ত লেগে থাকে চাপ চাপ হয়ে।

বড় পিপাসা লেগেছে, সামনে অথৈ পানি। কিন্তু সমুদ্রের লোনা পানি পান করার কোন উপায় নেই।

ফুল্লরা যত জোরে পারলো পা চালাতে থাকে।

সমুদ্রের তীর ছেড়ে দূরে কোথাও যেতে চায় সে।

কিন্তু কোথায় যাবে।

পা দুখানা ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে মোটরবোর্টটা থেকে যখন সে পড়ে গিয়েছিলো তখন পায়ে এবং হাঁটুতে আঘাত পেয়েছিলো বেশ। ফুল্লরা তা গ্রাহ্য করে না, তাই সে হাঁটতে থাকে আপন মনে।

অনেকটা পথ আসার পর হঠাৎ ফুল্লরা শুকনো মাটির মধ্যে অশ্ব খুরের চিহ্ন দেখতে পায়। আশায় আনন্দে বুকটা তার টিপ্ টিপ্ করে ওঠে। তবে কি তার অশ্ব এদিকে এসেছে। চারদিকে দৃষ্টি রেখে এগুতে থাকে ফুল্লরা।

হঠাৎ চমকে ওঠে সে, কিছু দূরে তার অশ্ব ছুটে আসছে।

হাঁ, তার দিকেই ছুটে আসছে।

ফুল্লরা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে। তবে কি তার অশ্ব তার সন্ধান করে ফিরছিলো? তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে। দস্যু বনহুরের অশ্বশালার সব অশ্বই শিক্ষিত, দুর্দান্ত। আস্তানার সবাইকে চেনেও আর সে কারণেই দূর থেকে তাকে দেখামাত্র ছুটে আসছে উল্কারগতিতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুল্লরার পাশে তার অশ্বটি এসে দাঁড়ালো।

ফুল্লরা আনন্দে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে মনের খুশি প্রকাশ করলো।

এবার ফুল্লরা চেপে বসলো তার অশ্বপৃষ্ঠে।

তারপর ছুটে চললো।

আর সে পথ ভুল করবে না। পথ ভুল করার জন্য তাকে অনেক বেগ পেতে হলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে এক সময় পৃথিবীর বুকে।

ফুল্লরা অত্যন্ত ক্লান্ত।

তার অশ্বও হাঁপিয়ে পড়েছে, কিছু সময় বিশ্রামের দরকার। ফুল্লরা, অশ্বপৃষ্ঠে বসে তাকালো চারদিকে, কোথাও কোনো জনবসতি দেখা যায় কিনা।

হঠাৎ ফুল্লরা দেখতে পেলো দূরে কিছুটা ধোয়া আকাশের দিকে কুন্ডলি পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে। ফুল্লরা ভাবলো নিশ্চয়ই কোনো লোকবসতি আছে সেখানে।

ফুল্লরা অশ্ব নিয়ে ছুটলো সেদিক লক্ষ্য করে। সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হবার পূর্বেই তাকে সেখানে পৌঁছতে হবে।

ধুম্রকুন্ডলি লক্ষ্য করে ফুল্লরার অশ্ব ছুটে চললো। চারদিকে ধু ধু প্রান্তর। ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেধে আসছে। যত সাহসী হোক না কেন ফুল্লরা নারী, কাজেই তার মনে ভীতির সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ফুল্লরার মনে ভয়ের ভাব দানা বেধে উঠলেও সে ভয়কে মোটেই আমল দিলো না। তাকে যেমন করে তোক আশার কুটিরে পৌঁছাতেই হবে। সেখানে রয়েছে তার প্রাণপ্রিয় জাভেদ।

একসময় পৌঁছে গেলো ফুল্লরা সেই ধূম্রকুন্ডলির কাছাকাছি। দেখতে পেলো একটি বৃক্ষতলে বসে আছে এক বৃদ্ধা। তারই সামনে অগ্নিকুন্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ফুল্লরা অশ্বপৃষ্ঠে বসে দূর থেকে লক্ষ করতে লাগলো। ভালভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছে না কারণ রাত্রির অন্ধকার স্থানটিকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে। অগ্নিকুন্ডের আলোকরশিতে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তা শুধু বৃদ্ধার মুখমন্ডল এবং তার দেহ।

শিউরে উঠলো ফুল্লরা।

বৃদ্ধার মুখমন্ডলে অগ্নিকুন্ডের আলো পড়ে। তাকে ভয়াবহ লাগছে মাথার চুলে জটাজুট, তা ছড়িয়ে আছে তার কাঁধে, পিঠে এবং মাটিতে। ললাটে চন্দন অথবা ঐ ধরনের কোনো সাদা বস্তুর আঁকা অদ্ভুত ছবি। হাতে এবং গলায় রুদ্রবক্ষের মালা। পরনে বাঘের চামড়া এবং বুকে বাধা বাঘের চামড়ার কিছু অংশ। দাঁতগুলো নেমে এসেছে ঠোঁটের ওপর।

সামনে অগ্নিকুন্ডের পাশে একটা ত্রিশূল পোতা রয়েছে। বৃদ্ধা চোখ মুদিত অবস্থায় বিড় বিড় করে কি যেন আওড়াচ্ছে।

অশ্বপৃষ্ঠে বসে ফুল্লরা ভাবল এ নারী সাধারণ নয়, সে যে কেমন মানুষ তাও বুঝতে পারবে না। তবু এই নির্জন জায়গায়, অসহায় মুহূর্তে একজন মানুষকে পেলো সে এটাই তার পরম সৌভাগ্য বলে মনে হলো।

ফুল্লরা অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে পড়লো তারপর অশ্বকে দূরে রেখে এগিয়ে এলো। একটু কেশে শব্দ করলো ফুল্লরা তারপর আরও সরে এলো।

বৃদ্ধা চোখ তুললো।

চমকে উঠলো ফুল্লরা।

সেকি দুটি অগ্নিচক্ষু। কি ভয়ংকর তার চাহনি।

ফুল্লরার কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেলো, হৃৎপিন্ড থর থর করে কেঁপে উঠলো। কি ভয়ংকর নারীমূর্তি।

ফুল্লরা ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে সেই মুহূর্তে কর্কশ কণ্ঠস্বর–বস্ আমার পাশে।

ফুল্লরা ঢোক গিলে কিছু বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। সে বাধ্য হয়ে এগিয়ে এলো এবং হাঁটু গড়ে বসলো বৃদ্ধার পাশে। অগ্নিকুন্ডটা তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অগ্নিকুন্ড হতে রাশিকৃত ধূম্র বেরিয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

বৃদ্ধার চোখ ভীষণভাবে জ্বলছে যেন।

ফুল্লরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললো–বাছা কোথা হতে এসেছিস?

ফুল্লরা কোনো জবাব দিতে পারে না।

বৃদ্ধা বলে উঠলো এবার আমি জানতাম সমস্ত দিন উপবাসে কাটালেও রাতে কেউ এসে যাবে।

ফুল্লরা বললো–উপবাস।

হাঁ, কিছু খাবি?

এক গেলাস পানি দিতে পারো আমাকে? বড় পিপাসা।

তোর দেহ থেকে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। আর তুই খাবি পানি? দেবো সব দেবো। বৃদ্ধার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। বললো বৃদ্ধা–এখানে বস্ আমি পানি

আনতে গেলাম।

বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ালো, তার দেহ থেকে একটা উৎকট গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো ফুল্লরার। কি বিশ্রী সে গন্ধ, ফুল্লরা দুহাতে নাক চেপে ধরলো।

বৃদ্ধা চলে গেলো কিন্তু কোথায় গেলো ঠিক বোঝা গেলো না। অন্ধকারে অদৃশ্য হবার মত হাওয়ায় মিশে গেলো যেন।

ফুল্লরা অগ্নিকুন্ডের আলোতে দেখতে পেলো, যা সে এতক্ষণ লক্ষ করেনি। বৃদ্ধার ঠিক পেছন দিকে একটি কংকালের স্তূপ। শুকনো বা পরিষ্কার কংকাল নয়, কাঁচা পঁচা পঁচা হাড়গোড় পড়ে আছে স্তূপাকারে। হাড়গুলো খন্ড আকারে এবং তার সঙ্গে এখনো কিছু কিছু মাংস লেগে রয়েছে। সেই হাড়গুলো হতে পচা গন্ধ বের হচ্ছে।

এ দৃশ্য লক্ষ করে ফুল্লরা ভীত হয়ে পড়লো।

সে তাকালে তার অশ্বটির দিকে। অন্ধকারে অশ্বটিকে দেখা যাচ্ছে না। তবে সে জানে তাকে ফেলে অশ্বটি চলে যাবে না কোথাও।

ফুল্লরা আরও দেখলে বিরাট একটি খাড়া বৃদ্ধার আসনটির পাশে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আসনটির তলা হতে খাড়াটি যেন উঁকি মারছে। খাড়াটি যেন তাকে বললো, ওরে হতভাগিনী এখানে কি করতে এসেছিস, শিগগির পালিয়ে যা।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে ফুল্লরা উঠে দাঁড়ালো।

যেমনি সে দৌড়ে পালাতে যাবে অমনি তার পথ আগলে দাঁড়ালো সেই বৃদ্ধা।

যমদূতকে সম্মুখে দেখলেও এত ভয় পেত না ফুল্লরা।

চিৎকার করতে চাইলে সে, কিন্তু চিৎকার করেই বা লাভ কি ফুল্লরা জানতো না ধুম্ররাশি তাকে বিপদমুক্ত না করে মৃত্যুর পথে টেনে আনবে। মোটরবোটের সেই দুস্কৃতিকারীদের চেয়েও বৃদ্ধাকে ভয়ংকর মনে হলো। কি ভয়ংকর মুহূর্ত তার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে। ফুল্লরা যেন বোবা স্তব্ধ হয়ে গেলো, একচুলও সে নড়তে পারলো না।

বৃদ্ধা বললো–পালাতে চাইলেও আর পালাতে পারবি না, আমার সঙ্গে সংযোগ হয়ে গেছে তোর ধমনি…

ফুল্লরার দুচোখে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠেছে। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধার কথামত সে তার সঙ্গে এগিয়ে যায় অগ্নিকুন্ডের দিকে।

বৃদ্ধা তার আসনে বসে ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে বলে–বস্।

ফুল্লরা বসে পড়লো তার পাশে। চোখ দুটো তার অগ্নিকুন্ডের দিকে স্থির হয়ে আছে।

অগ্নিকুন্ডের লেলিহান শিখার মধ্যে ফুল্লরা দেখলো এক রাক্ষসীমূর্তি তাকে গ্রাস করার জন্য দুহাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফুল্লরা চিৎকার করে উঠলোনা না, আমি পানি পান করবো না।

বৃদ্ধার হাতে একটি আশ্চর্য ধরনের পানির পাত্র। পাত্রটি কোনো মৃত ব্যক্তির মাথার খুলি ছাড়া কিছু নয়। বৃদ্ধা সেই আশ্চর্যজনক পানির পাত্রটি ফুল্লরার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললো–নে পানি পান কর।

ফুল্লরা ভীতভাবে সেই বিস্ময়কর পানির পাত্রটি হাতে নিলো এবং সন্ধিগ্ধচিত্তে তাকালো পাত্রটির দিকে। তারপর কৌশলে পান করার ভান করে পাত্রের পানিও ঢেলে দিলো নিজের গলার নিচে কাপড়ের মধ্যে। তারপর পাত্রটি রেখে দিলো।

বৃদ্ধা অট্টহাসি হেসে উঠলো, সেকি ভীষণ আর ভয়ংকর হাসি সমস্ত স্থানটি যেন কেঁপে কেঁপে উঠলো। ফুল্লরার বুকটাও কেঁপে উঠলো।

বললো বৃদ্ধা–নে, ঘুমিয়ে পড়।

ফুল্লরা বললো এবার–বুড়ীমা, তুমি খাবে না কিছু?

আবার হাসলো বৃদ্ধা বিকট স্বরে।

ফুলরা তাকিয়ে আছে বৃদ্ধার মুখের দিকে।

বললো বৃদ্ধা–ঘুমিয়ে পড়। নে, আমি নিজেও ঘুমালাম।

বৃদ্ধা শুয়ে পড়লো।

ফুল্লরাও বাধ্য হয়ে শুয়ে পড়লো তার পাশে।

কি ভয়ংকর আর উৎকট গন্ধ, সে গন্ধ ফুল্লরা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তবু তাকে শুয়ে পড়তে হলো।

ফুল্লরা মিছামিছি ঘুমের ভান করলো।

কিন্তু সে প্রস্তুত হয়ে নিলো, সহজে সে মৃত্যুবরণ করবে না। এতগুলো দুস্কৃতিকারীর কবল থেকে নিজকে সে উদ্ধার করে নিয়েছে, এবারও সে চেষ্টা চালাবে। বৃদ্ধা যে রাক্ষসী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশে তার স্তূপাকার কংকাল। কত মানুষকে সে হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে খেয়েছে। হাড়গোড়গুলোতে এখনও কিছু কিছু মাংস লেগে রয়েছে। মাংসগুলো পঁচে এমন উৎকট গন্ধ বের হচ্ছে। পেটের নাড়ীভুড়ি বেরিয়ে আসার জোগাড়। ফুল্লরা প্রহর গুনছে, বৃদ্ধা ওপাশ হয়ে শুয়ে। সেও প্রতীক্ষা করছে, শিকার তার পাশে, একটু ঘুমিয়ে পড়লেই হয়।

কিন্তু ফুল্লরা আর বিলম্ব করলো না, সে চুপি চুপি বৃদ্ধার পাশ থেকে সূতীক্ষ্ণধার খাঁড়াখানা তুলে নিলো হাতে।

ফুল্লরা খাড়টা হাতে তুলে নিতেই অগ্নিকুরে লালচে আলোতে চকচক করে উঠলো। ফুল্লরা চোখের সামনে খাড়াটা তুলে ধরলো তারপর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সজোরে বসিয়ে দিলো বৃদ্ধার ঘাড়ে।

এত বেশি ধারালো ছিলো খাড়াটা যে আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিখন্ডিত হয়ে গেলো বৃদ্ধার কাঁধ হতে মাথাটা। একটু শব্দ করার মত সময় বৃদ্ধার হলো না, দেহটা বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলো।

ফুল্লরা নিঃশ্বাস ফেলে বাচলো।

সে বৃদ্ধার মাথাটা পা দিয়ে সোজা করে ধরলো, তারপর পদাঘাত করলো ওর মুখে বারকয়েক। এই রাক্ষসী কত লোককে হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

এবার ফুল্লরা তার অশ্বের সন্ধানে এদিক ওদিক তাকালো। চারদিকে থমথমে জমাট অন্ধকার। অগ্নিকুন্ডের আলোটা ক্রমে শিথিল হয়ে আসছে। তাই দৃষ্টি বেশিদূর যায় না, ফুল্লরা ভাবলো এই অগ্নিকুন্ডের পাশে কোনো হিংস্র জীবজন্তু আসবে না, কাজেই এই স্থান কতকটা নিরাপদ বলে মনে হলো তার কাছে এই মুহূর্তে।

অদূরে হিংস্র জীবের চেয়ে ভয়ংকর সেই বৃদ্ধার দ্বিখন্ডিত দেহ। ভীতিভাব মনে জাগলেও তা মুছে ফেলতে চেষ্টা করলো ফুল্লরা। ভীষণ এক বিপদ থেকে এই দভে সে মুক্তি পেয়েছে। বৃদ্ধার মৃতদেহের দিকে তাকাবার সাহস তার হচ্ছিলো না। হঠাৎ যদি আবার সে জীবিত হয়ে ওঠে।

ফুল্লরা জানে যে একবার মরে যায়, সে আর জীবিত হয় না তবুও তার মন যেন কেমন কাঁপছে।

এক সময় ভোর হয়ে এলো।

ফুল্লরা কোনো রকমে দুহাটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে ছিলো এতক্ষণ নির্বাপিত অগ্নিকুন্ডটার পাশে। বুকটা তার দুরু দুরু করছিলো, একটা পাতা পড়ার শব্দ হলেই সে ভীষণভাবে চমকে উঠছিলো কারণ অদূরেই রাক্ষসী বৃদ্ধার মৃতদেহ। জনশূন্য স্থান, এমন কি তার অশ্বটিও পাশে নেই।

হঠাৎ একটা শব্দ।

ফুল্লরা আঁৎকে উঠলো, তবে কি বৃদ্ধা পুনঃ জীবন লাভ করলো, সে কি আবার তাকে আক্রমণ করবে? ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে ফিরে তাকাতেই আনন্দে আপ্লুত হলো ফুল্লরা, দেখলো তার অশ্বটি এগিয়ে আসছে তার দিকে।

ভোরের আলোতে চারদিক পরিষ্কার নজরে পড়ছে। অগ্নিকুন্ডটা জ্বলে জ্বলে এক সময় ভস্মে পরিণত হয়েছে। পাশে রাক্ষসী বৃদ্ধার মস্তক বিহীন দেহটা পড়ে আছে, তার পাশে একটু দূরে ছিটকে পড়েছে বৃদ্ধার জটাজুটধারী মাথাটা। মাথাটার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলো ফুল্লরা। এখনও চোখ দুটো মেলে আছে। দাঁতগুলো কি বিকট আর ভয়ংকর দেখাচ্ছে।

ফুল্লরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তার অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো। এবার ফুল্লরাকে নিয়ে তার অশ্ব উষ্কাবেগ ছুটতে আরম্ভ করলো।

এবার আর ফুল্লরার পথ ভুল হলো না।

বন প্রান্তর পাহাড় পর্বতের পাদমূল ধরে এক সময় আশার কুটিরের কাছাকাছি এসে পৌঁছে গেলো ফুল্লরা তার অশ্ব নিয়ে।

দূর থেকে ফুল্লরা লক্ষ করলো আশার কুটিরের অদূরে একটি ঝর্ণার পাশে পাথরখন্ডের ওপরে পাশাপাশি বসে আছে একটি তরুণী আর তার জাভেদ। জাভেদকে পেছন থেকে দেখেও চিনতে তার ভুল হয় না। আশার কুটির নজরে পড়তেই ফুল্লরা যেমন আনন্দিত হয়ে উঠেছিলো তেমনি মুহূর্তে তার সব খুশি উবে গেলো কর্পূরের মত।

ফুল্লরা অশ্বপৃষ্ঠ হতে নেমে আলগোছে একটা গাছের আড়ালে এসে দাঁড়ালো। তার চিনতে ভুল হয়নি জাভেদ একটি তরুণীর পাশে বসে আছে। তরুণী আংগুল দিয়ে দূরে কিছু দেখাচ্ছে। তবে কি ঐ তরুণীটিকে জাভেদ বিয়ে করেছে, আর সেই কারণে জাভেদ তাকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গেছে। কে ঐ তরুণী যে তার প্রিয় জাভেদকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। ফুল্লরার শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে।

এমন সময় জাভেদ উঠে দাঁড়ালো।

তরুণীটি ওর হাত ধরে একটি হরিণশিশুকে দেখালো, কিছু বললো সে জাভেদকে।

জাভেদ আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে হরিণ শিশুকে পেছন দিক থেকে ধরে ফেললো, তারপর কোলে করে এসে দাঁড়ালো তরুণীটির পাশে।

তরুণীটি অন্য কেউ নয় হুমায়রা।

কে সঙ্গে করে প্রায়ই ঝর্ণার ধারে এসে বসে, নানা গল্প শোনায়। কখনও বা ঝর্ণার পানি নিয়ে খেলা করে দুজনে। কোনো কোনো সময় ঝর্ণার পানিতে স্নান করে ওরা দুজন, সাঁতার কাটে মনের আনন্দে। তবে জাভেদ সব সময় নীরব থাকতে চায়। সে প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কি যেন ভাবে, স্মরণ করতে চায়। আনমনা জাভেদকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা হুমায়রার।

হরিণ শিশুটিকে কোলে করে জাভেদ যখন হুমায়রার পাশে এসে দাঁড়ালো তখন হুমায়রা খুশিতে উচ্ছল হয়ে জাভেদের গলা দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলো।

এ দৃশ্য ফুল্লরার কাছে অসহ্য, তার মনকে অস্থির করে তুললো। যা সে ভেবেছিলো তা সত্য। জাভেদকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার প্রতিহিংসা জেগে উঠলো ফুল্লরার মনে। সে আঁচলের আড়ালে কোমরের খাপ থেকে খুলে নিলো ছোরাখানা। একবার ছোরাটার দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো ফুল্লরা। তারপর তাকালো সে জাভেদ আর হুমায়রা দিকে। হুমায়রা তখন জাভেদের কোল থেকে হরিণশিশুটাকে কোলে তুলে নিচ্ছিলো।

ফুল্লরা মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছোরাখানা হুমায়রাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো।

ছোরাটা এসে বিদ্ধ হলো হুমায়রার পিঠে।

তীব্র আর্তনাদ করে হুমায়রা পড়ে গেলো মাটিতে।

হরিণশিশুটা ছুটে পালিয়ে গেলো বনের গভীরে।

জাভেদ হতভম্ব হয়ে পড়লো।

সে তাড়াতাড়ি হুমায়রাকে তুলে ধরলো কিন্তু হুমায়রা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে তখন।

ফুল্লরা বেরিয়ে আসে।

জাভেদের হাত দুখানা চেপে ধরে বলে–জাভেদ, তুমি আমাকে ভুলে ওর প্রেমে আত্মহারা হয়ে পড়েছো? আমি অনেকগুলো হত্যা করেছি শুধু তোমার জন্য। তোমাকে খুঁজে খুঁজে আমি উন্মাদিনী হয়ে পড়েছি আর তুমি……চলো এখানে তোমাকে আর এক মুহূর্ত থাকতে দেবো না। ওঠো, ওঠো জাভেদ……।

জাভেদ মন্ত্রমুগ্ধের মত উঠে দাঁড়ালো।

হুমায়রার রক্তাক্ত দেহ তার মাথার মধ্যে কেমন যেন সব এলোমেলো করে দিয়েছে। ফুল্লরার হাতের মুঠা থেকে নিজের হাতখানা সরিয়ে নেবার মত সংজ্ঞা তার ছিলো না।

জাভেদ একবার তাকাচ্ছে ভূলুণ্ঠিত হুমায়রার দিকে, আবার তাকাচ্ছে ফুল্লরার মুখে।

ফুল্লরা বললো–চলো আমার সঙ্গে। চলো তুমি।

জাভেদের হাত ধরে নিয়ে আসে ফুল্লরা তার অশ্বের পাশে। জাভেদকে জোরপূর্বক অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে নিজেও চেপে বসে ফুল্লরা। তারপর ফুল্লরা অশ্বের লাগাম চেপে ধরে ছুটতে থাকে।

ফুল্লরার অশ্বখুরের শব্দ শুনতে পায় আশা।

সে বেরিয়ে আসে কুটিরের বাইরে।

অশ্বপদ শব্দ দূরে সরে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আশা মনে করে কোনো শিকারী বনে এসেছিলো তাই হয়তো ফিরে যাচ্ছে। আশাও চলে যায় কুটিরের ভেতরে এবং নিজ কাজে মনোযোগ দেয়।

বনহুর কিন্তু আশার কুটিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে চলে আসে। রহমানের কাছে সংবাদটা শোনার পর তার মন অস্থির হয়ে উঠেছিলো। জাভেদকে নূরীর হাতে তুলে দিতে পারলে সে নিশ্চিন্ত হবে।

বনহুর তাজসহ আশার কুটিরের অদূরে এসে পৌঁছবার পূর্বেই তার নজর পড়ে হুমায়রার ভুলুণ্ঠিত দেহটা। তাড়াতাড়ি বনহুর অশ্ব থেকে নেমে ছুটে যায়, তখনও সে জানে না ভুলুণ্ঠিত দেহটা কার।

নিকটবর্তী হয়ে ওর মাথাটা ফেরাতেই চমকে উঠলো বনহুর? এ যে হুমায়রা, যাকে সে আশার কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলো। দ্রুতহস্তে হুমায়রার পিঠ থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে ফেলে। তারপর ওর হাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী পরীক্ষা করে। বনহুর বুঝতে পারে হুমায়রা মৃত্যুবরণ করেনি। ঠিকভাবে চিকিৎসা হলে জীবনে বাঁচতে পারে।

বনহুর হুমায়রার দেহটা হাতের ওপর তুলে নেয়। তারপর আশার কুটিরের দিকে পা বাড়ায়।

পদশব্দে বেরিয়ে আসে আশা।

বনহুরকে এ অবস্থায় দেখে আশা হতভম্ব হয়ে যায় মুহূর্তের জন্য।

বনহুর হুমায়রার রক্তাক্ত দেহটা নামিয়ে রাখে আশার কুটিরের বারান্দায়।

আশা চিৎকার করে বলে ওঠে–একি হয়েছে, হুমায়রার? কে ওকে ছোরাবিদ্ধ করেছে।

বনহুর বলে–আমি জানি না। তাকে ঝর্ণার পাশে এই অবস্থায় পেয়েছি।

জাভেদ কোথায়? হুমাতো ওর সঙ্গে গিয়েছিলো।

বনহুর আশার মুখে দৃষ্টি রেখে বললোকই, জাভেদকে তো সেখানে আশেপাশে কোথাও দেখলাম না।

জাভেদ নেই?

না

তাহলে কি হুমায়রাকে সে এইভাবে খুন করে পালিয়েছে। আশা হুমায়রার রক্তাক্ত দেহের পাশে বসে ব্যাকুলভাবে ডাকতে থাকে—-হুমা, তোকে সে এভাবে হত্যা করলো? বল্ হুমা, জাভেদ কোথায়? সেই কি তবে তোকে ছোরাবিদ্ধ করেছে? কি সর্বনাশ করলো সে। তোমার গচ্ছিত ধন আমি যত্নে রাখতে পারলাম না বনহুর। তুমি আমাকে মাফ করো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো

বনহুর কোনো জবাব দিতে পারে না, তারও চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে। জাভেদ হুমায়রাকে কেন ছোরাবিদ্ধ করলে তা ভেবে পাচ্ছে না। তবে জাভেদ যে এ কাজ করতে পারে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। জাভেদ তাহলে গেলো কোথায়?

আশা যখন হুমায়রার মুখমন্ডলে হাত বুলিয়ে ব্যথা আর দুঃখে ভেঙে পড়ছিলো তখন বনহুর। বললো—-আশা, হুমায়রা এখনও মৃত্যুবরণ করেনি। তার ঠিকমত চিকিৎসা হলে জীবনে বাঁচতে পারে।

হুমায়রা তাহলে মরে যায়নি বনহুর?

না, সে সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েছে। তার অত্যন্ত রক্তক্ষরণ হয়েছে, কাজেই রক্তের প্রয়োজন।

আমি দেবো রক্ত বনহুর। কিন্তু কি করে এই নির্জন গহন বনে তুমি ওর চিকিৎসা করবে?

ওকে শহরে নিয়ে যেতে হবে।

বললো আশা–তোমার অসাধ্য কিছু নেই, কাজেই তুমি যদি ওকে বাঁচাতে পারো…

বেশ আমি ওকে নিয়ে যাবে। যদি বাঁচানো সম্ভব হয় তাহলে আবার ফিরে আসবো ওকে নিয়ে তোমার এখানে, আর যদি…..

আশা বনহুরের মুখে হাতচাপা দেয়–না না, ওকথা বলো না। হুমা বড় ভাল মেয়ে ওকে বাঁচাতে হবে। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

বেশ চলো। তৈরি হয়ে নাও তুমি।

আশা আঁচলে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো।

বনহুর তার ক্ষুদে ওয়ারলেসে আস্তানায় কথা বললো।

আশা তার নিজের অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

বনহুর তাজের পিঠে হুমায়রাকে তুলে নিলো তারপর সে উঠে বসলো।

*

হসপিটালে বসে আছে পাশাপাশি বনহুর আর আশা। ওদের শরীরে সাধারণ ড্রেস, কেউ তাদের চিনতে পারবে না। নিজেদের নাগরিক বলে ওরা হসপিটালে পরিচয় দিয়েছে।

হুমায়রার শরীরে প্রচুর রক্ত দিতে হলো। এ রক্ত আশা এবং বনহুর দিয়েছে। ভাগ্য ক্রমে বনহুর আর আশার রক্ত হুমায়রার রক্তের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে তাই রক্ষা।

বনহুরের সর্বক্ষণ হসপিটালে থাকা সমীচীন নয় তাই শুধু আশা রয়ে গেলো। বনহুর মাঝে মধ্যে এসে দেখে যেতে হুমায়রাকে তখন দেখা হতো আশার সঙ্গে।

ক্ষণিকের দেখার প্রতীক্ষায় আশা প্রহর গুনতে।

হুমায়রার শিয়রে বসে ভাবতো গত জীবনের কথা। পৃথিবী তাকে কি দিয়েছে আর সেই বা পৃথিবীকে কি দিতে পারলো। জীবনে সে কোনো পুরুষকে মনের আসনে স্থান দেয়নি, বড় কঠিন তার মন। কোনো পুরুষ তার হৃদয় জয় করতে পারেনি। ঐ একটিমাত্র লোক যাকে সে ভালবেসেছিলো মনপ্রাণ দিয়ে, যদিও সে তাকে পাবে না কোনো দিন জানতো তবুও কেন তাকে এমন করে মনের আসনে স্থান দিয়েছিলো আশা নিজেই জানে না। এমনি কত কি ভাবতত আশা হুমায়রার শিয়রে বসে। আরও অনেক চিন্তা ভীড় জমাতো তার মনের গহনে। হুমায়রাকে পেয়ে সে অনেকটা শান্তি পেয়েছিলো, ভাবতো যাক একজন সঙ্গিনী তার জুটলো যাকে সে সর্বক্ষণ নিজের পাশে পাবে। কিন্তু হঠাৎ এমন করে হুমায়রা তাকে ছেড়ে চলে যাবার পথে পা বাড়াবে ভাবতে পারেনি সে।

আশার গণ্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

নার্স তা দেখতে পায়, তার পাশে এসে সান্ত্বনা জানায়–বোন, ভেবো না, ও ভাল হয়ে যাবে। প্রচুর রক্তপাত হয়েছে বলে জ্ঞান ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে।

আশা চোখের পানি মুছে তাকায় নার্সের দিকে।

একদিন সুস্থ হয়ে ওঠে হুমায়রা।

বনহুর আর আশার চোখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। হুমায়রাকে নিয়ে তারা ফিরে আসে আবার সেই কুটিরে।

হুমায়রা খোঁজে তার ইন্দ্রনাথকে।

সব সময় ভাবে ওর কথা।

হসপিটালে দিনগুলো তার আশায় আশায় কেটেছে। হুমায়রা আশাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ইন্দ্র কোথায়? সে কেন এখানে আসে না? তার কি হয়েছিলো, তাকে কেন বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে এমনি কত প্রশ্ন হুমায়রা করেছে আশাকে।

আশা শুধু বলেছে, হুমা, তুমি আরোগ্য লাভ করো, সব জানতে পারবে।

তাই হুমায়রা কুটিরে ফিরে আসার পর ধরে বসলো একদিন, আশা আপু, তোমাকে বলতেই হবে ইন্দ্রনাথ কোথায়? আমার কি হয়েছিলো? সব বলল আমি জানতে চাই……

আশা এতদিন চেপে গেলেও এখন আর সে চুপ থাকতে পারে না। বলে আশা– তোমার ইন্দ্রনাথ চলে গেছে সবার অলক্ষে।

কোথায় গেছে জানো না? বললো হুমায়রা।

হুমায়রা যখন হসপিটালে তখনই আশা বনহুরের কাছে জানতে পেরেছিলো ফুল্লরা এসে জাভেদকে নিয়ে গেছে আস্তানায়। হুমায়রাকে ছোরাবিদ্ধ কে করেছে ফুল্লরা না জাভেদ এ কথা ওরা কেউ বলেনি। তবে ফুল্লরা জাভেদকে এক মুহূর্তের জন্য দৃষ্টির আড়াল হতে দেয়না। সব সময় সে ওর কাছাকাছি থাকে।

আশা নীরব হয়ে গিয়েছিলো, কোনো জবাব সে সেদিন দিতে পারেনি। কারণ আশা জানতো জাভেদ ফুল্লরার শিশুবেলার সাথী। জাভেদের ওপর তার যেমন অধিকার আছে হুমায়রার তেমন নেই। আশা মাথা নিচু করে ছিলো সেদিন বনহুরের সম্মুখে।

বনহুর বুঝতে পেরেছিলো আশার মনের কথা তাই সেও কোনো জবাব দেয়নি বা প্রশ্ন করেনি কিছু।

আজ হুমায়রার প্রশ্নের জবাবে আশা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে যায়। তাকায় সে একবার হুমায়রার মুখে তারপর দূরে ঐ সীমাহীন আকাশের দিকে।

হুমায়রা বলে–আশা আপু, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছি। তুমি বলতে আমি সুস্থ হয়ে উঠলে সব কথা বলবে?

আমি কিছু জানি না হুমা, আমি কিছু জানি না। শুধু জানি তুই তোর ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ঝর্ণার ধারে গিয়ে বসেছিলি তারপর আমি অশ্ব পদ শব্দ শুনতে পাই। মনে করি কোনো শিকারী অথবা কোনো পথ চারী তার অশ্ব নিয়ে ভুল করে এ পথে এসেছিলো। অশ্ব পদ শব্দ আবার মিশে যায়, দূরে আরও দূরে। আমি নিজের কাজে মনোযোগী হই। তারপর বেশ কিছুক্ষণ কেটে যায়। হঠাৎ উঠানে কারো পদশব্দ শুনতে পাই। কুটির হতে বেরিয়ে এসে দেখি বনহুর উঠানে প্রবেশ করেছে, তার হাতের ওপর তোর রক্তাক্ত দেহ।

তারপর আশা আপু? তারপর?

আমি আর্তনাদ করে ছুটে এলাম তোর পাশে। বনহুর তখন তোর রক্তাক্ত দেহটা কুটিরের দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে। আমি যখন কাঁদছিলাম তখন বনহুর আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলো, আশা, ঠিকমত চিকিৎসা করতে পারলে হয়তো হুমায়রা আরোগ্য লাভ করতে পারে। ও মরে যায়নি। আমি তখন কিছুটা শান্ত হলাম এবং তাকে প্রশ্ন করলাম কে হুমাকে ছোরাবিদ্ধ করেছে? বনহুর জানালো, জাভেদকে সেখানে সে দেখতে পায়নি। শুধু তোর রক্তাক্ত দেহটা পড়ে ছিলো ছোরাবিদ্ধ অবস্থায়....

না না, ইন্দ্র আমাকে ছোরাবিদ্ধ করেনি। তার কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না আমি তা ভালভাবেই জানি। তাহলে কোনো শত্রু তাকেও ধরে নিয়ে গেছে। আমার ইন্দ্র তাহলে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না আশা আপু?

জানি না হুমা।

তুমি কিছু বলে আশা আপু। আমার কেউ নেই কিছু নেই, শুধু ইন্দ্রকে আমি পেয়েছিলাম আমার জীবনসাথী হিসেবে।

এই তো আমি আছি হুমা। আমি আছি তোর পাশে।

আশা আপু.......হুমায়রা দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো, তারপর আশার বুকে মুখ লুকালো

হুমায়রার কান্না আশার চোখ দুটোকে সিক্ত করে তুললো। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো ওর মাথায়। হুমায়রার অন্তরের ব্যথা আশা হৃদয় দিয়ে অনুভব করছে। আশা জানে, ফুল্লরার কাছ থেকে হুমায়রা হয়তো কোনোদিন জাভেদকে কেড়ে নিতে পারবে না। ওকে আজীবন কাঁদতে হবে এমনি করে.....আশা নীরবে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে চলে।

*

উঃ! কি ভয়ংকর কাহিনী। চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বললো নূর। একটু থেমে পুনরায় বললো সে–আরমান, তুমি যে জীবনে বেঁচে ফিরে এসেছে এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। পুলিশ মহল ছাড়াও গোয়েন্দা বিভাগ তোমার সন্ধানে গোটা

কানাই চষে ফিরেছে। আমি নিজেও একেবার হাঁপিয়ে পড়েছিলাম, দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছিলাম আর বুঝি সফলকাম হলাম না।

সত্যি আর আমি কোনোদিন ফিরে আসতে পারতাম না যদি সেই মহান ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করতে উৎসাহী না হতেন। নর, তিনি মানুষ নন ফেরেস্তা বলা যায়, তার অসীম শক্তি আর পৌরুষদীপ্ত সৌম্যসুন্দর চেহারা–আমি একটি মুহূর্তের জন্য তাকে ভুলতে পারছি না।

নূর একটু থেমে বললো–তোমার মুখে যে বর্ণনা এবং যে বিস্ময়কর কাহিনী শুনলাম তা সত্যি আশ্চর্যজনক এবং ভয়ংকর কিন্তু সেই ব্যক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করছি যিনি তোমাকে এই ভয়ংকর অবস্থা হতে রক্ষা করেছেন। নূর আরমানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বেশ বুঝতে পারে কে সে মহান ব্যক্তি। নূরের মন আনন্দপুত হয়ে ওঠে।

আরমান বুঝতে পারে না কেন নূরের মুখমন্ডল আনন্দদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কেন তার চোখে খুশির উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ছে। কেন তার কণ্ঠ এত উচ্ছল।

বললো আরমান–বন্ধু, তোমার ভালবাসা আমাকে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে।

তুমি তো আমারই জন্য এই ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলে?

সে আমার কর্তব্য। কর্তব্য পালনে আমি পূর্বে যেমন উৎসাহী ছিলাম আজও আছি।

আরমান এবং নূর মিলে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো, তখন মনিরার গাড়ি এসে থামলো নূরের বাংলোর সম্মুখে।

আরমান আর নূর জানতো মনিরা আসবে, কাজেই তারা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো।

সত্যি মনিরা এসেছে।

আনন্দদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো নুর–আম্মি তুমি এসে গেছো? এই যে আরমান ফিরে এসেছ।

মনিরা হেসে বললো–তাইতো আমি এলাম।

আরমান নতমস্তকে দাঁড়ালো মনিরার পাশে। বললো–আপনাদের দোয়ায় আমি উদ্ধার পেয়েছি।

নূর বললো–ওর কাহিনী যদি শুনতে তাহলে অবাক হতে আম্মি। সে এক বিস্ময়কর কাহিনী।

ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

নূর ও আরমানের অলক্ষ্যে মনিরা একবার ড্রাইভারের মুখে তাকিয়ে দেখে নিলো।

দাড়ি-গোঁফ ঢাকা ড্রাইভারের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির আভাস ফুটে উঠলো। বললো ড্রাইভার–মেম সাহেব, গাড়ি নিয়ে আবার কখন আসবো?

নূরই জবাব দিলো–আজকে আমার এখানে তোমার দাওয়াত রইলো।

মনিরা বললো–তা হয় না নূর, কারণ বাসায় গাড়ির দরকার হতে পারে। ওকে ছেড়ে দে বাবা।

আজ তোমার কথা রাখতে পারছি না আম্মি। ওকেও আমাদের সঙ্গী করে নিলাম। কথাগুলো বলে একটু হাসলো নূর।

আরমান বললো–আমিও নূরের সঙ্গে একমত।

মনিরা আবার তাকালো ড্রাইভারের মুখের দিকে।

উভয়ের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো।

নূর বললো–চলো আম্মি, ওপরে চল।

হা চলো।

নূর, আরমান এবং মনিরা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।